বাংলাপিডিএফ ডট নেট

টয়লার্স অভ দ্য সী

ভিক্টর হুগো

রূপান্তর ঃ সমীর দাস

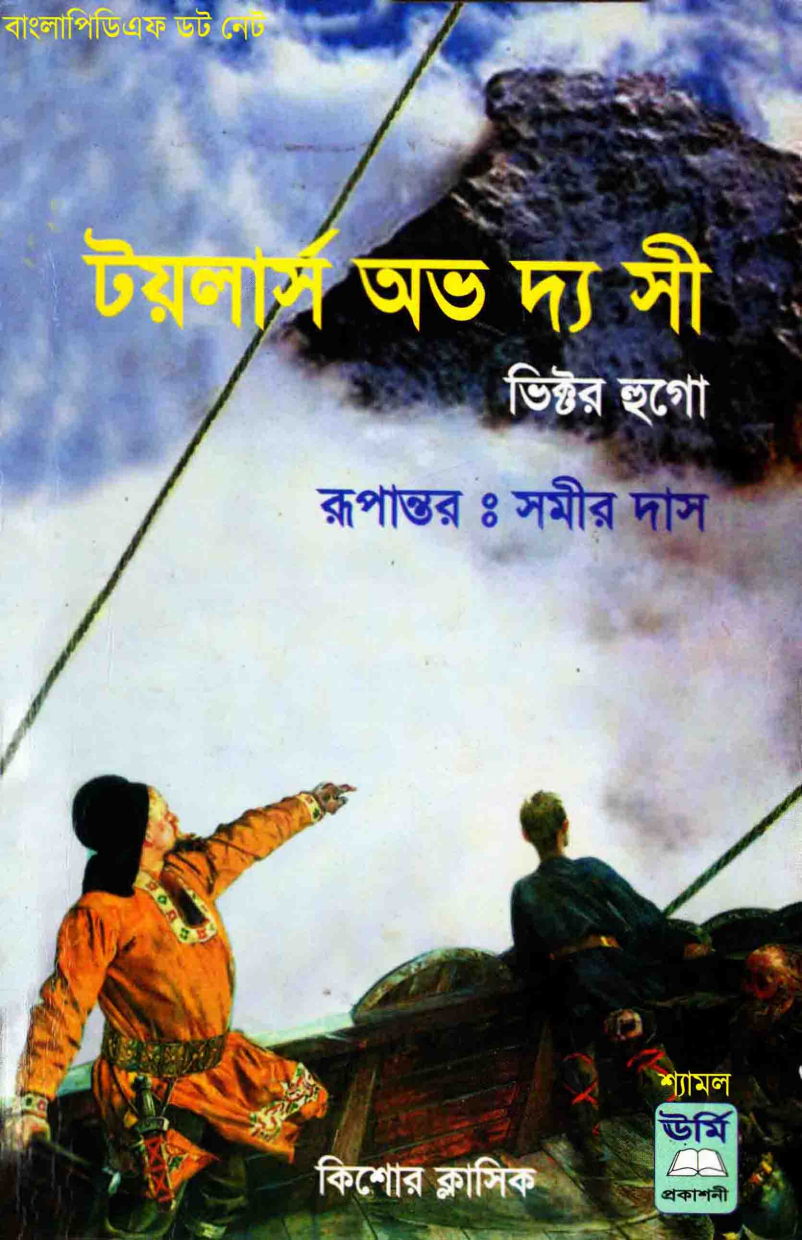

শ্যামল
ঊর্মি
প্রকাশনী

কিশোর ক্লাসিক

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

টয়লার্স অভ দ্য সী

ভিক্টর হুগো

রূপান্তর ঃ সমীর দাস

সম্পাদনা ঃ ইফতেখার আমিন

ঊর্মি প্রকাশনী

প্রকাশক
ইফতেখার আমিন
উর্মি প্রকাশনী
বাড়ি নং ১৩-এ, রোড নং ৩
ঢাকা - ১২০৫

স্বত্ব ঃ লেখকের

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০২

প্রচ্ছদঃ ফারহান সিদ্দিক

মুদ্রাকর ঃ ইউনাইটেড আর্ট প্রেস,
২১/১ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা -১১০০

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
উর্মি প্রকাশনী
বাড়ি নং ১৩-এ, রোড নং ৩
ঢাকা - ১২০৫
টেলিফোন ঃ ৯৬৬৫৮৮৯, ০১৭-০৫৮৯৫৫

TOILERS OF THE SEA
By VICTOR HUGO
Trans. By Sameer das

ত্রিশ টাকা

আমার মাকে ঃ-
যিনি আমার শত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেন

এক

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ইংলিশ চ্যানেল নামে দিগন্ত বিস্তৃত এক সাগর।

তার ঢেউ খেলানো নীল পানির বুক ফুঁড়ে এখানে-সেখানে জেগে আছে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপ। সেগুলোর মধ্যে একটার নাম গেরানসি। এই দ্বীপের ছোট্ট এক গ্রাম স্যামসন। আজ এখানকার মানুষের আনন্দের দিন। কারণ আজ বড়দিন, পঁচিশে ডিসেম্বর।

একে বড়দিন, তারওপর এবার শীতের শুরু থেকেই দ্বীপে বেশ তুষারও পড়ছে। এমনিতে নিয়মিত তুষারপাত হয় না গেরানসিতে, তাই ব্যাপারটা শুরু হলে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু আজ ন'টা বেজে যাওয়ার পরও কোথাও সেরকম কিছু চোখে পড়ছে না।

চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। রাস্তায় মানুষজন নেই। বিশেষ উৎসবের দিনের আনন্দ-উল্লাসের কোন লক্ষণ তো নেই-ই, তুষার নিয়েও কারও যেন কোন মাথাব্যথা নেই। চ্যানেলের তীর ঘেঁষে একটা রাস্তা গ্রামের এক মাথা থেকে আরেক মাথা

পর্যন্ত চলে গেছে, ওটাই প্রধান রাস্তা এখানকার। গোটা গ্রামের সাথে সেটাও আজ তুষারের পুরু চাদরের তলায় চাপা পড়ে আছে।

কুয়াশার আবছা পর্দা ভেদ করে সূর্যের নিস্তেজ আলো সবেমাত্র স্যামসনের বুক ছুঁয়েছে। কনকনে শীত। এত শীতও সাধারণত পড়ে না গেরানসিতে, হয়তো সেজন্যেই বিশেষ দিন হওয়া সত্ত্বেও মানুষজন ঘর ছেড়ে পথে বেরোতে তেমন উৎসাহ বোধ করছে না।

তবু, এর মধ্যেও তিনজনকে দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। যেন গ্রামবাসীর মান রাখতেই বেরিয়েছে তারা—একটি ছোট ছেলে, এক সুন্দরী তরুণী এবং এক যুবক। তুষারমোড়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে।

ছেলেটি রয়েছে সবার আগে, মাঝখানে তরুণী এবং যুবক পিছনে। ছাড়াছাড়া হয়ে যে যার মত পথ চলেছে ওরা তিনজন। দেখলেই বোঝা যায় কারও সাথে কারও সম্পর্ক নেই। ছেলেটির বয়স বছর আটেক হবে। চলতে চলতে প্রায়ই থমকে দাঁড়াচ্ছে সে, শিশুসুলভ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চারদিকের বরফের বিস্তার দেখছে। চেহারায় প্রচণ্ড কৌতূহল ওর।

সম্ভবত গ্রামের সেইন্ট পিটার গির্জা থেকে আসছে ওরা, বড়দিনের বিশেষ প্রার্থনায় যোগ দিতে গিয়েছিল। যুবককে দেখলে শ্রমিক বা নাবিকগোছের কিছু মনে হয়। পরনে ক্যাম্বিসের ঢিলেঢালা পাজামা গায়ে বাদামী রঙের মোটা গেঞ্জি। খুব সাধারণ বেশভূষা যুবকের। বিশেষ উৎসবের দিনের কোন আমেজ নেই তাতে। আনমনা, উদাসীন প্রকৃতির মানুষ সে। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এমনভাবে হাঁটছে যেন এ

জগতেই নেই। সামনের জলজ্যান্ত সুন্দরীটির দিকে পর্যন্ত তাকাচ্ছে না।

তরুণীর সাজ-সজ্জা সম্পূর্ন উল্টো। আজকের উপযুক্ত সাজেই সেজেছে সে। চলার মধ্যে রয়েছে সাবলীল একটা ভাব। ওকে দেখলে যে কেউ সহজেই বুঝবে জগৎ-সংসারের কঠিন কোন দায়িত্ব এখনও ছুঁতে পারেনি মেয়েটিকে। দিব্যি সুখে আছে।

কিছুদূর যেতে পথের পাশে বেশ কয়েকটা বড় বড় ওক গাছ পড়ে। সেগুলোর তলায় পৌঁছতে অনেকটা যেন বেখেয়ালেই হাঁটার গতি কমে গেল তরুণীর, ঘুরে তাকাল। চোখ পড়ল যুবকের ওপর। সে তখন ওর শ'খানেক হাত পিছনে, ধীর পায়ে হেঁটে আসছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল তরুণী। কিছু ভাবল খানিক, তারপর একটুখানি হেসে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পথের ওপর কি যেন করল। কাজ সেরে সোজা হয়ে আবার পিছনে তাকাল ও, চোখাচোখি হয়ে গেল যুবকের সাথে।

এবার টনক নড়ল তার, সামনের তরুণীটিকে এতক্ষণে যেন চিনতে পেরেছে। ও আর কেউ নয়, তারই প্রতিবেশী—অপরূপা দেরুশেত। যুবকের সাথে চোখাচোখি হতেই মেয়েটি বাতাসে মন পাগল করা এক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বাঁ-দিকের এক গলিতে ঢুকে পড়ল। উধাও হয়ে গেল মুহূর্তে

যুবকের মধ্যে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে মনে হলো না। যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকল। আনমন, উদাসীন। দেরুশেত যে গাছগুলোর নিচে থেমেছিল, কয়েক মিনিট পর সেখানটায় এসে পৌঁছল যুবক।

নরম তুষারের বুকে একজোড়া ছোট, মেয়েলি পায়ের ছাপ ফুটে আছে দেখতে পেয়ে ক্ষণিকের জন্যে হাঁটার গতি পড়ে গেল তার। শুধু পায়ের ছাপই নয়, সাথে আরও কিছু আছে ওখানটায়। অতি পরিচিত একটা নাম–গিলিয়াত।

আঙুলে তুষার কেটে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে যুবকেরই নাম। দেরুশেত লিখেছে।

বুকের রক্ত মুহূর্তের তরে চঞ্চল হয়ে উঠল তার। চার অক্ষরের নামটার দিকে কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকল সে, ছোট ছোট পায়ের ছাপগুলোও কিছুসময় দেখল। খানিক পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল সে, মাথা নিচু করে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে।

দুই

স্যামসন গেরানসি দ্বীপের কয়েকটা নৌ-বন্দরের অন্যতম, ছোটখাট এক বন্দর। এখানকার বাসিন্দাদের বেশিরভাগই সাগরের ওপর নির্ভরশীল পেশাজীবী। কেউ জাহাজের নাবিক, কেউ বা জেলে। অনেকে নিজ নিজ নৌকায় করে আশপাশের দ্বীপগুলোয় নানান পণ্য পরিবহণের কাজও করে।

গিলিয়াত স্যামসনের বাসিন্দা হলেও স্থানীয় নয়, এখানকার কারও সাথে তার তেমন সম্পর্ক নেই। তাই সবার থেকে দূরে দূরে থাকে ও। স্থানীয়রা ভাবে গিলিয়াত খাপছাড়া মানুষ।

তার বাড়িও অনেকটা তেমনি–গ্রামে থেকেও গ্রামছাড়া, চ্যানেলের তীর ঘেঁষে পানির ওপর জেগে থাকা এক টিলার ওপরে। যেন মালিকের মত ওটারও একা থাকতেই পছন্দ।

সরু একটা খাঁড়ি টিলাটাকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে বাড়িটা বলতে গেলে গ্রাম থেকে একরকম বিচ্ছিন্নই হয়ে আছে। সরু একটা পাথুরে রাস্তা ওটার সাথে গ্রামের যোগসূত্র রক্ষার কাজ করছে। বাড়ির চারপাশে বাগান করার মত ছোট্ট একটু জায়গাও আছে, তারপরই একদম খাড়া হয়ে সাগরে নেমে গেছে টিলার কিনারা। ওখানটায় সাগরের গভীরতা অনেক বেশি।

জোয়ারের সময় কখনও কখনও বাড়ির চারদিকের জমিটুকুও তলিয়ে যায়। বাড়িটা গিলিয়াতদের নিজেদের তৈরি নয়, অন্যের কাছ থেকে কিনে নেয়া। অতীতে এক সময় স্থানীয়রা ওটাকে 'দৈত্যপুরী' নামে ডাকত।

কারণ জোয়ারের সময় পানি বাড়তে বাড়তে যখন ও বাড়ির ভিটা ছুঁই ছুঁই করত, তখন নাকি ভেতর থেকে বিকট গুম্ গুম্ আওয়াজ উঠত, মনে হত কোন অতিকায় দানব বাড়িটার ছাদে হেঁটে বেড়াচ্ছে বুঝি। সে আওয়াজ কানে এলে ভয়ে বুক কেঁপে উঠত গ্রামের মানুষের।

জায়গাটা মনোরম দেখে অনেক বছর আগে এক লোক সখ করে বাড়িটা তৈরি করিয়েছিল। কিন্তু ওটায় থাকা আর হয়ে ওঠেনি বেচারার। সেই রহস্যময়, ভীতিকর শব্দের কারণে একদিন তল্লাট ছেড়ে পালিয়ে গেল সে।

তারপর কিছুকাল পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল বাড়িটা। গ্রামের কেউ ভুলেও ওটার ত্রিসীমানার ধার ঘেঁষত না। এর

বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ কোত্থেকে যেন একদিন গিলিয়াতরা এসে ওই বাড়িতে উঠল।

গ্রামের মানুষ ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক মনে নিল না। ওটাই শেষ পর্যন্ত এই আগন্তুক পরিবারটির সাথে গ্রামবাসীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পথে কঠিন এক দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

সে কবেকার কথা—আজ থেকে কম করেও পঁচিশ বছর আগে স্যামসনে এসেছে গিলিয়াতরা। এতদিনেও গ্রামবাসীর সাথে তাদের সম্পর্কের বলতে গেলে কোন উন্নতিই হলো না।

একটু পিছনের পানে তাকানো যাক্। প্রায় সিকি শতাব্দী আগে, ফরাসী বিপ্লবের শেষের দিকে একদিন মাঝবয়সী এক বিধবা মহিলা তার একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে গেরানসিতে এসে নামল

ছেলে সন্তান ছিল সেটি। সে সময় তার বয়স পাঁচ কি ছয় হবে। মহিলা ইংরেজ না ফরাসী, নাকি আর কোন জাতের, গ্রামের কেউ জানত না। জানার চেষ্টাও করেনি কখনও। তার চেহারা দেখেও ব্যাপারটা অনুমান করার উপায় ছিল না।

তার উপাধীও আরেক অজ্ঞাত ব্যাপার। সেটা কি যে ছিল, আজ আর তা নিশ্চিত জানার কোন উপায় নেই, কেননা গেরানসির স্থানীয়দের উচ্চারণ অনুযায়ী সেটা ক্রমে বদলে গিয়ে 'গিলিয়াত' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহিলাকে গ্রামের সবাই মিসেস গিলিয়াত বলে সম্বোধন করত। সেই সূত্রে ছেলেটিও কালক্রমে গিলিয়াত হয়ে গেল। টাকা-পয়সা মোটামুটি মন্দ ছিল না মিসেস গিলিয়াতের, কিছুদিনের মধ্যেই 'দৈত্যপুরী' কিনে নিল সে। তার এই দুঃসাহস দেখে গ্রামের মানুষজন শুধু যে বিস্মিত হলো তাই

নয়, এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল যে ওই বাড়িতে উঠে গ্রামের বহুদিনের পুরানো এক সংস্কারের গোড়ায় যেন কুড়াল মেরে বসেছে মহিলা।

যে বাড়িটাকে কেন্দ্র করে গেরানসির মানুষ এতদিন রাজ্যের জল্পনা-কল্পনা করে এসেছে, নানান মুখরোচক গল্প ফেঁদে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে, সেই বাড়িতে কোথাকার কোন্ এক মেয়েছেলে তার শিশু সন্তান নিয়ে একাই বাস করতে শুরু করেছে, কেউ তা মেনে নিতে পারল না।

সে যা হোক্, মিসেস গিলিয়াত সুরুচিসম্পন্ন মানুষ ছিল। 'দৈত্যপুরীতে' উঠে প্রয়োজনীয় মেরামতীর কাজ সেরে ওটাকে নতুন করে রং করিয়ে নিল সে, নিজের হারিয়ে যাওয়া রূপ ফিরে পেয়ে ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল বাড়িটা।

তারপর গ্রাম থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন সেই বাড়িতে দুই মা-ছেলের দিন বেশ ভালভাবেই কেটে যেতে লাগল। দিনে দিনে বড় হয়ে উঠতে লাগল গিলিয়াত।

মিসেস গিলিয়াত বাড়ির সামনের এক চিলতে জমিতে চমৎকার একটা ফুলের বাগান গড়ে তুলল, অল্পদিনে ফুলে ফুলে ভরে উঠল সেটা। শৈশব কাটিয়ে একসময় কৈশোরে পা দিল গিলিয়াত, তারপর তারুণ্যে।

অবশেষে এল যৌবন। এই সময় বড় একটা ধাক্কা খেল সে। বেশ কয়েক বছর থেকে নানান রোগে শয্যাশায়ী ছিল মা—একদিন হঠাৎ করে নিথর হয়ে গেল।

মানুষ যেমন বহু ব্যবহারে জীর্ণ পোশাক একসময় ফেলে দেয়, মহিলার আত্মাও তেমনি করে তার দেহপিঞ্জর ফেলে রেখে কোন অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাল। ব্যাপারটা

অপ্রত্যাশিত ছিল না, কিন্তু গিলিয়াত বেশ কঠিন ধাক্কা খেল। অবশ্য ছেলেকে পথে বসিয়ে রেখে যায়নি মিসেস গিলিয়াত, তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে রেখেই গেছে।

বাড়িটা তো রইলই, সেই সাথে গিলিয়াতের জীবনধারণের জন্যে কয়েক হাজার নগদ টাকাও রেখে গেছে সে। আরও কিছু রেখে গেছে নিজের শোবার ঘরের এক কোনায় রাখা মস্ত একটা বাক্সে। ওটার গায়ে তার নিজের হাতে লেখা আছে ঃ আমার পুত্রবধূর জন্যে।

গিলিয়াত জানে না ওটার মধ্যে আসলে কি আছে। তবে শুনেছে, তার ভাবী বউয়ের জন্যে মা ওর ভেতরে অনেকগুলো মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার তুলে রেখেছে যত্ন করে। ছেলের সামনে কখনও বাক্সটা খোলেনি মিসেস গিলিয়াত। তার বড় সাধ ছিল, পুত্রবধূ বাড়িতে পা রেখে নিজের হাতেই প্রথম খুলবে ওটা। কিন্তু এসবে কি মন মানে?

মায়ের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে ওর নিঃসঙ্গ জীবন একেবারে হাঁপিয়ে উঠল। ঘরে মন টেকে না, তাই সাগরের তীরে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। জোর বাতাসে চ্যানেলের পানি যখন ফুলে-ফেঁপে ওঠে, তখন মন তার কোন্ অজানার পানে ছুটে যায় কে জানে!

সদ্য মা হারা সন্তানের অবুঝ অন্তর আকুল আবেগে হাহাকার করতে থাকে তখন, নীরব বোবা কান্নায় গুমরে মরে গিলিয়াত। একসময় ছল-ছল চোখে বাড়ি ফিরে আসে, অবুঝ শিশুর মত বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

তিন

গিলিয়াত ছেলেটা দেখতে-শুনতে মোটামুটি ভালই। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, কপালটা সামান্য উঁচু। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, ঝাঁকড়া চুল ওর। বড়বড় চোখ, রাজ্যের মায়াভরা।

উদাস, বেখেয়াল গোছের ছেলে। তার যে বয়স, সে বয়সে সবাই নিজের বেশভূষার দিকে স্বভাবতই একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখে, কিন্তু ও সে ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন।

দেহের গঠন যেমনই হোক, তার শক্তি ছিল অসাধারণ। যে সমস্ত ভারী ভারী জিনিস এক কুড়ি মানুষে মিলেও তুলতে পারত না, সেসব গিলিয়াত একাই তুলে ফেলতে পারত। ওর সাথে লড়াই করতে এসে সে কালের অনেক নামকরা কুস্তিগীরকেও হার স্বীকার করতে হয়েছে। দু'হাতে সমান দক্ষতার সাথে তীর-বন্দুক চালাতে পারত গিলিয়াত।

এছাড়া গিলিয়াতের মত দক্ষ সাঁতারু আর দুঃসাহসী নাবিক ওই তল্লাটে দ্বিতীয় কেউ ছিল না। একেকসময় ওর উন্মত্ত সাগরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার বিপজ্জনক দুঃসাহস দেখে ভয়ে-বিস্ময়ে জবান আটকে যেত গ্রামের মানুষের। এরকম অনেক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে স্যামসনের মানুষ–ভীষণ

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ইংলিশ চ্যানেল মত্ত আক্রোশে ফুঁসছে, এমন সময় প্রায় সময়ই দেখা গেছে মাঝ সমুদ্রে একটা খুদে নৌকা উথাল-পাথাল করছে, ঢেউয়ের মাথায় চাঁটি মেরে এগিয়ে চলেছে মরনপণ করে।

কারও বুঝতে বাকি থাকত না ওই নৌকার মাঝিটি কে হতে পারে। একবার এক নৌকা বাইচের উৎসবে গিলিয়াত তার অসম সাহসিকতার প্রমাণ দিয়ে উপস্থিত প্রত্যেকের তাক্ লাগিয়ে দিল। বাইচে অংশ নিতে যার যার নৌকা নিয়ে অনেকেই এসেছিল সেবার।

তীরে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার শেষ পর্যন্ত বাইচের অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গেল সেদিন। তার বদলে আয়োজনকারীরা একটা ছোট নৌকা নিয়ে অন্য এক ধরনের বাজি ধরল।

ঠিক হলো, যে ওই নৌকায় করে গিয়ে তিন মাইল দূরের হারয দ্বীপ থেকে নৌকা বোঝাই পাথর নিয়ে ফিরে আসতে পারবে, তাকে নৌকাটা উপহার দেয়া হবে। অনেকেই এগিয়ে এল অংশ নিতে। কে কতখানি পাকা নাবিক, তা প্রমাণ করার সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

সাগরের মাঝে বাস করতে করতে মানুষ এমনিতেই দুঃসাহসী ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। প্রতিযোগীরাও প্রত্যেকেই তাই, কিন্তু কিছু সময় যেতে না যেতে দেখা গেল সাত-আটজন নামকরা, দক্ষ নাবিক সাগরের দুরন্তপনার কাছে হার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে, ঘাট ছেড়ে যাওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই একে একে তীরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। বেয়াড়া ইংলিশ চ্যানেলের সাথে এঁটে উঠতে পারেনি তারা।

সবার শেষে এল গিলিয়াতের পালা। চ্যানেলের অবস্থা আরও খারাপ তখন, ঝড়ের মাতামাতি বেড়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত করল না যুবক, নৌকা ছেড়ে দিল। তীর থেকে দূরে সরে গেল সেটা। দেখতে দেখতে উত্তাল, এলোমেলো ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

তীরে অপেক্ষমাণ রুদ্ধশ্বাস দর্শকরা ভয়-ডরহীন হতচ্ছাড়া যুবকটির পরিণতির কথা ভেবে হায় হায় করতে লাগল। কিন্তু ঘণ্টাতিনেক পর তাদের অনুমান মিথ্যে প্রমাণ হলো।

হারয থেকে গিলিয়াত নৌকা বোঝাই পাথর নিয়ে নিরাপদেই ফিরে আসতে পেরেছে দেখে চরম বিস্ময়ে আর অবিশ্বাসে চোয়াল ঝুলে পড়ল তাদের।

বাজির শর্ত অনুযায়ী নৌকাটা গিলিয়াতকে উপহার দেয়া হলো। ছোট হলেও বেশ মজবুত ছিল সেটা। সেদিন থেকে নৌকাটি হয়ে উঠল ওর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। যখনই ও সাগরে যায়, ওটায় চড়েই যায়।

রাতের গাঢ় আঁধার যখন ধরণীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলত, চ্যানেলের ক্রুদ্ধ গর্জনে কান পাতা দায় হয়ে উঠত, তখন সেই খুদে নৌকায় চড়ে প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে কতদিন যে সাগরে মাছ ধরতে গেছে সে, কেউ তার হিসেব রাখেনি।

মাছ ধরা ছিল গিলিয়াতের প্রধান সখ। ইচ্ছেমত যখন-তখন সাগরে মাছ ধরে বেড়াত। নিজের প্রয়োজনে তার থেকে একটা-দুটো রেখে বাকি মাছ হয় ছেড়ে দিত ও, নয়তো গ্রামবাসীর মধ্যে বিলিয়ে দিত।

গ্রামের অন্য সবার মত ব্যবসা-ট্যবসার দিকে তেমন নজর ছিল না গিলিয়াতের। মা সঞ্চিত টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিল

বলেই হয়তো সেসবের দরকার হত না। তাই বলে বুদ্ধির ঘাটতি ছিল না তার। দু'একটা চমৎকার কারিগরী কাজ নিজে থেকেই শিখে নিয়েছিল।

ছোটখাট এটা-সেটা ভালই তৈরি করতে পারত গিলিয়াত। এ জন্যে বাড়ির আঙিনার একধারে খুদে একটা কামারখানাও গড়ে নিয়েছিল। সেখানে বসে ইচ্ছেমত দা, কুড়ুল, নোঙর ইত্যাদি বানাত। সেসব বাড়িতে মজুত রাখত গিলিয়াত, কারও প্রয়োজন হলে তাকে বিনা পয়সায় দিয়ে দিত।

কিছু কিছু অদ্ভুত ধরনের খেয়ালও ছিল গিলিয়াতের। তার একটা হচ্ছে বন্দি পাখি পেলেই ছেড়ে দেয়া। এ খবর গ্রামবাসীর জানা ছিল, তাই অনেকেই পাখি ধরে নিয়ে আসত ওর কাছে। আর ও সেগুলো কিনে নিয়ে ছেড়ে দিত।

মুক্তির আনন্দে পাখিরা যখন আকাশে ডানা মেলে দিত, আনন্দে চিৎকার করতে করতে উড়ে যেত, গিলিয়াত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত। কি এক অনাবিল আনন্দে ওর চোখমুখ ঝলমল করত সে সময়ে।

এই পাখিকে কেন্দ্র করে একবার একটা ঘটনা ঘটল। গ্রামের এক কিশোর একদিন গাছে উঠে পাখির বাসা থেকে কয়েকটা পাখির ছানা নিয়ে নেমে আসছিল, এমন সময় গিলিয়াত এসে হাজির সেখানে।

ছেলেটার হাত থেকে ওগুলো কেড়ে নিয়ে তখুনি গাছে উঠে পড়ল গিলিয়াত, পরম যত্নের সাথে জায়গামত রেখে এল। গ্রামের মুরুব্বি গোছের কয়েকজন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল ওই সময়। এই ঘটনা দেখে তারা ছেলেটির পক্ষ হয়ে গিলিয়াতকে বেশ কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিল।

প্রতিবাদ দূরে থাকুক, গিলিয়াত একটা কথাও বলল না। শুধু হাত তুলে তাদেরকে দেখাল শাবকহারা মা পাখিগুলো কিভাবে আর্ত চিৎকার করছে আর গাছের ওপর অনবরত চক্কর দিচ্ছে। ওর চোখ ছল-ছল করছিল তখন ওর মনের অবস্থা অনুমান করতে পেরে আর কথা বাড়ায়নি লোকগুলো, বিস্ময় চেপে রেখে চলে গেল।

গ্রামের একজন সৈনিকের কাছ থেকে একটা ব্যাগপাইপ বাঁশি কিনেছিল গিলিয়াত। প্রায়ই সন্ধের পর সাগরের তীরে বসে করুণ সুরে বাজাত সেটা।

বাজাতে বাজাতে উদাস হয়ে পড়ত—কখন আঁধার নেমেছে, রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলেছে, হুঁশ থাকত না তার। গভীর নিশীথে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা গাঁয়ের লোকে কতদিন যে তন্ময় হয়ে গেছে তার সেই বাঁশির করুণ সুরের বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালে, তার হিসেব নেই।

নিজের খেয়াল খুশিমত দিন কাটাত গিলিয়াত। গ্রামের মানুষ মনে করত ছেলেটা ছন্নছাড়া, ভবঘুরে। একটা অপদার্থ ছাড়া কিছু নয়।

অথচ অন্যের উপকার করার ক্ষেত্রে স্যামসনে গিলিয়াতের কোন জুড়ি ছিল না। কেউ কোন সমস্যায় পড়লে সবার আগে ওকেই স্মরণ করত, আর ও-ও সানন্দে ছুটে যেত। সে যত কঠিন সমস্যাই হোক না কেন, পরোয়া করত না গিলিয়াত।

ওর বাড়িটা যে টিলায়, তার কিছুটা দূরে, সাগরের মধ্যে গ্র্যানিট পাথরের আরেকটা উঁচু টিলা আছে। ওটার আকৃতি দেখলে মনে হয় পানিতে ডুব দিয়ে থাকা মোষের খাড়া শিং, পানির ওপর জেগে আছে বুঝি। এই জন্যে স্থানীয়রা ওটার নাম রেখেছে 'মহিষ পাহাড়'।

তীর থেকে একটা সঙ্কীর্ণ পাথুরে রাস্তা আছে ওটায় যাওয়ার। জোয়ারের সময় পানি বাড়লে ডুবু ডুবু হয়ে যায় রাস্তাটা, নইলে এমনিতে সব সময় পানি থেকে অনেকখানি জেগে থাকে। ঢেউয়ের ক্রমাগত ঝাপ্টায় পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এক প্রস্থ সিঁড়ির মত বেশ কিছু ধাপের সৃষ্টি হয়েছে টিলাটার গায়ে, সেই ধাপ বেয়ে ওটার চূড়ায় ওঠা যায়।

স্রোতের কারণে 'মহিষ পাহাড়ের' চূড়ার কাছের খানিকটা জায়গা সমতল হয়ে চমৎকার একটা সিংহাসনের আকার পেয়েছে। প্রকৃতি তার অদ্ভুত খেয়ালবশে সিংহাসনটায় ঠেস্ দিয়ে বসার জন্যে একটা ব্যাকরেস্ট, এমনকি হাত রাখার জন্যে দু'পাশে দুই হাতলও তৈরি করে দিয়েছে। পানির ওপরে যখন জেগে থাকে, 'মহিষ পাহাড়ে' গিয়ে ওঠার লোভ সামলানো তখন সত্যিই খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

আবার গেলে সমস্যাও আছে। চলমান জাহাজ , পাল তোলা নৌকার বহর আর চারদিকের অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা, এইসব দেখতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় দুনিয়াদারি ভুলে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত কারও বেলায় যদি তেমনটা ঘটে, টেরও পায় না সে কখন জোয়ার এসেছে চ্যানেলে–তার দ্বীপে ফিরে যাওয়ার পথ তলিয়ে গেছে সাগরে, 'মহিষ-পাহাড়' ডুবিয়ে দিতে খুব দ্রুত উঠে আসছে। অসহায়ের মত মৃত্যুকে মেনে নেয়া ছাড়া তখন আর কোন পথ খোলা নেই তার।

শোনা যায়, ওই টিলায় গিয়ে অতীতে স্যামসনের দু'একজন বেখেয়াল বাসিন্দা এভাবেই প্রাণ হারিয়েছে। তাই স্থানীয় কেউ জোয়ারের সময় ওখানে যাওয়ার দুঃসাহস ভুলেও করে না। অবশ্য গিলিয়াতের কথা আলাদা।

একেবারেই আলাদা ধাঁচের মানুষ ও, তাই বিশে তাই 'মহিষ পাহাড়ের' সাথে বিশেষ সখ্যতা গড়ে নিয়েছে। ওর বাড়ি থেকে 'মহিষ পাহাড়ের' দূরত্ব তেমন বেশি নয়, ইচ্ছেমত যখন-তখন সেখানে চলে যায় গিলিয়াত। সিংহাসনে বসে প্রায়ই কি যেন গভীর ভাবনায় তলিয়ে যায়। জোয়ারের পানিকে ও থোড়াই কেয়ার করে।

কতদিন গভীর রাতে জোয়ারের পানির ভয়াবহ গুরু গর্জনের শব্দ ছাপিয়ে 'মহিষ পাহাড়' থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসতে শুনেছে স্যামসনের মানুষ। সেখানকার ছেলে-বুড়ো সবার খুব ভালই পরিচিত ওই বাঁশি।

ওরকম অপূর্ব সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করার মত খেয়ালী বাদকটি যে কে, তাও তারা ভালই জানে।

চার

জাহাজ ব্যবসায়ী বৃদ্ধ লেতিয়ারি স্যামসনের নাম করা ধনীদের একজন। পেশাদারী জীবনের শুরুতে জাহাজের সাধারণ নাবিক ছিল লোকটা, আর আজ নিজেই একটা জাহাজের মালিক। তাও যেমন-তেমন কোন জাহাজের নয়, একেবারে স্টীম এন্‌জিন চালিত আধুনিক বাণিজ্য জাহাজের।

প্রায় সত্তর বছরের জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা গেছে লেতিয়াবির ওপর দিয়ে, কিন্তু কোনদিন কোনকিছুর কাছেই

নতি স্বীকার করেনি সে। অথচ দুর্ভাগ্য, শেষ পর্যন্ত অভিশপ্ত ব্যাধি বাতের কাছে তাকে হার মানতেই হলো।

বাত প্রায় অচল, পঙ্গু করে ফেলেছে তাকে। এখন তাই ঘরের মধ্যে একরকম বন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে সে। যে জীবন কিছুকাল আগে পর্যন্ত বলতে গেলে জাহাজে করে সাগর পাড়ি দিয়েই কেটেছে, আজকাল সেই জীবনকে সুদূর অতীতের কোন মিষ্টি মধুর স্বপ্নের মত মনে হয় তার। লেতিয়ারিদের কয়েক পুরুষের আদি পেশা ছিল মূলত জাহাজের নাবিকের চাকরি। পৃথিবীর সাথে লেতিয়ারির প্রথম পরিচয়টা বলতে গেলে সাগরের বুকেই হয়েছিল।

তাই তার খুব ইচ্ছে ছিল সময় হলে মৃত্যুও যেন সাগরেই হয়, পানিতে ভাসতে ভাসতেই যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে সে। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছেই কি পূরণ হয়? এখন বাতে প্রায় অচল হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে বুড়ো লেতিয়ারি।

যে সাগরের আচরণ, মতিগতি পর্যবেক্ষণ করে জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে, সেই সাগরের সাথে আজ তার সম্পর্ক চিরতরে ঘুচে গেছে। তারপরও স্যামসনে লেতিয়ারির সাথে কারও তুলনাই হয় না।

সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের মানুষ। পরাজয় কাকে বলে জানে না। কাজ যত কঠিনই হোক না কেন, একবার হাতে নিলে সেটা শেষ না করে ছাড়েনি সে কখনও।

প্রায় ষাট বছর ধরে সাগর বহু কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে তার ওপর দিয়ে, কিন্তু কোনদিন কাবু করতে পারেনি। 'মহিষ পাহাড়ের' মত অটল থেকে সমস্ত ঝড়-ঝাপ্টার মোকাবেলা করে গেছে লেতিয়ারি।

বিশালদেহী মানুষ সে। প্রশস্ত, ঢালু কাঁধ। বুকের পাটাও তেমনি। গলার স্বর ভরাট, গম্ভীর। হাত দু'টো দেহের তুলনায় বেশ দীর্ঘ। ও দু'টোর মত তার অন্তরটাও বড়, উদার। বিপত্নীক সে, এবং নিঃসন্তান।

সংসারে দু'টি স্নেহের পাত্র-পাত্রী আছে লেতিয়ারির। একটি দেরুশেত, অন্যটি দুরান্দ। দেরুশেত তার ভাইঝি। বাপ-মা মরা এই মেয়েটিই বৃদ্ধের জীবনের প্রধান অবলম্বন। খুব ছোট থাকতে মেয়েটিকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে সে, সন্তানের মত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বড় করেছে। ষোলয় পা দিয়েছে এখন দেরুশেত।

চমৎকার ছিপছিপে গড়ন। চোখ দু'টো হরিণের মত টানা টানা, মায়াবী। অতুলনীয় সুন্দর মুখখানায় মিটিমিটি হাসি সবসময় লেগেই থাকে। গেরানসিতে দেরুশেতের মত সুন্দরী মেয়ে দ্বিতীয়টি নাকি নেই।

লেতিয়ারিকে বাবা ডাকে মেয়েটা। গ্রামের সবাই জানে দেরুশেত তারই মেয়ে। আর দুরান্দ? দুরান্দ হচ্ছে তার প্রিয় জাহাজের নাম-গেরানসির প্রথম স্টীম এন্‌জিন চালিত জাহাজ। সেই পালতোলা নৌকা-জাহাজের যুগে ওরকম বাষ্প চালিত অত্যাধুনিক জাহাজ সাগরে নামানোর মত যুগান্তকারী পদক্ষেপ কেবল লেতিয়ারির মত দৃঢ়চেতা, কঠিন সংগ্রামী এবং দূরদর্শী নাবিকের পক্ষেই নেয়া সম্ভব।

একসময় লেতিয়ারির পণ্য পরিবহণের খুব রমরমা ব্যবসা ছিল। নিজের পুরানো স্কুনারে নানান মালপত্র বোঝাই দিয়ে মাসের পর মাস এ-বন্দর সে-বন্দর করে বেড়াত সে। এভাবে

ঘুরতে ঘুরতেই একদিন এক বন্দরে নিজের মত আরেক দুঃসাহসী নাবিকের সাথে পরিচয় হয় তার।

লোকটির নাম রাতাগ। তার নিজেরই মত দীর্ঘ, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিল মানুষটা। একই রকম কর্মঠ, নির্ভীক। তাকে এক বিশেষ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছিল সে, তাই তার প্রতি রাতাগের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। লেতিয়ারিরও ভাল লেগেছিল রাতাগকে।

তাই তাকে গেরানসিতে নিয়ে এল সে। এবং অল্পদিনের মধ্যে বুঝে ফেলল লোকটা যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং বিশ্বস্ত। এরকম একজন সাহায্যকারী থাকলে খুবই উপকার হয় তার। নিজের খাটুনি অনেক কমে যাবে, আবার সেই সাথে ব্যবসাও আগের মত সমান তালেই চলতে থাকবে।

কাজেই লোকটাকে নিজের জাহাজ ব্যবসার একেবারে অর্ধেক অংশীদার করে নিয়ে ওটার সম্পূর্ণ ভার তার হাতেই তুলে দিল সে।

রাতাগ ছিল খুব চাপা স্বভাবের মানুষ, সারাক্ষণ মুখ বুজে থাকত। নিজের সম্পর্কে কখনও কারও সামনে মুখ খুলত না। এই কারণে গেরানসিতে দীর্ঘদিন থাকার পরও তার ব্যাপারে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানত না মানুষ।

লোকটার চাল-চলন, কথাবার্তা, গতিবিধি, সবই কেমন যেন রহস্যময় ছিল। লোকে বলাবলি করত, রাতাগ করতে পারে না এমন কাজ নাকি পৃথিবীতে নেই। বেশ কয়েক বছর সাফল্যের সাথে লেতিয়ারির জাহাজের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করল লোকটা। পরিবহণ ব্যবসা আবার ফুলে-ফেঁপে উঠল।

তার ব্যাপারে সে যখন পুরোপুরি নিশ্চিত, তখনই হঠাৎ একদিন রাতের আঁধারে উধাও হয়ে গেল রাতাগ। জানা গেল খালি হাতে যায়নি সে, লেতিয়ারির অফিসের সিন্দুকে নগদ টাকাকড়ি যা ছিল, সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে।

ওটায় তার নিজেরও অল্প কিছু সঞ্চয় ছিল ঠিকই, কিন্তু লেতিয়ারির ছিল পুরো পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ—বলতে গেলে তার সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের অমানুষিক পরিশ্রমের অর্ধেক ফসল।

মাল কেনার জন্যে মাত্র ক'দিন আগে টাকাটা সে ব্যাংক থেকে তুলে এনে সিন্দুকে রেখেছিল। রাতাগকে খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করল লেতিয়ারি, কিন্তু কাজ হলো না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে একেবারে।

কিন্তু তাই বলে ভেঙে পড়েনি লেতিয়ারি, শেষ সম্বল আরও পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ ছিল তার, ঠিক করল তাই দিয়ে একটা বাষ্পীয় এনজিন চালিত জাহাজ কিনবে এবার, আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে ভাগ্য ফেরানোর।

আধুনিক বাষ্পীয় জাহাজের চল সবেমাত্র শুরু হয়েছে সে আমলে। যে কথা সেই কাজ, একদিন ফ্রান্সের পথে পাড়ি জমাল লেতিয়ারি, এবং ছয় মাস পর আজবদর্শন এক জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরে ফিরে এল।

ভীষণ গর্জনের সাথে কুচকুচে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওটা যখন জেটিতে এসে ভিড়ল, গোটা দ্বীপের মানুষ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। প্রথমে সবাই ভাবল জাহাজটায় আগুন ধরে গেছে বুঝি, নইলে ওরকম ধোঁয়া উঠবে কেন?

অবশ্য কিছুক্ষণ পর বুড়ো লেতিয়ারিকে উদ্ভাসিত চেহারায় ওটা থেকে নেমে আসতে দেখে ভুল ভাঙল তাদের। লেতিয়ারি

সবাইকে আশ্বস্ত করল, আগুন-টাগুন কিছু নয়, জাহাজটা বাষ্পীয় এনজিন চালিত বলে ওভাবে ধোঁয়া ছাড়ে।

আরও জানাল, তার নিজের জাহাজ ওটা। এক নামকরা ফরাসী এনজিনিয়ারকে দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছে। খরচ পড়েছে চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ। গোটা বন্দরে রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে গেল এই খবরে। অদ্ভুত এনজিনটা দেখার জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতায় লেগে পড়ল আশপাশের প্রতিটা গ্রামের মানুষ।

একমাত্র আদরের ধন দেরুশেতের নামের সাথে মিল রেখে লেতিয়ারি ওটার নাম রাখল দুরান্দ। আবার নতুন করে পুরোদমে ব্যবসায়ে লেগে পড়ল।

সাধারণ পালের জাহাজের তুলনায় দুরান্দের বহন ক্ষমতা এবং গতি, দুটোই ছিল অনেক বেশি। অল্প সময়ে বেশি বেশি পণ্য আনা-নেয়া করতে পারে দুরান্দ। তাছাড়া ওটাতে করে সমুদ্রযাত্রা ছিল যেমন নিরাপদ, তেমনি আরামের। কাজেই দিনে দিনে ওটার চাহিদা বাড়তে থাকল। ফলে লেতিয়ারির তখন একেবারে পোয়াবারো।

তার শূন্য সিন্দুক ক্রমে আবার ভরে উঠতে শুরু করল। দেখতে দেখতে সে গেরানসির অন্যতম শীর্ষ ধনীদের একজনে পরিণত হলো।

কিন্তু হঠাৎ করে বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল লেতিয়ারি। তবে ভাগ্য ভাল, তার আগেই আরেক যুবককে শিখিয়ে-পড়িয়ে ওস্তাদ নাবিক বানিয়ে নিতে পেরেছিল সে।

এখন বাতে প্রায় পঙ্গু লেতিয়ারি। সাগর পাড়ি দেয়ার মত কঠিন দায়িত্ব তার পক্ষে আর চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না,

তাই দুরান্দের পুরো দায়িত্ব সেই যুবকের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে বসে এখন কেবল হিসেব-পত্র দেখাশোনার কাজ করে সে সারাদিন।

বন্দরের প্রবেশপথের কাছে মস্তবড় একটা বাড়ি কিনে নিয়েছে লেতিয়ারি। বাড়িটার পশ্চিম আঙিনায় সুন্দর একটা ফুলের বাগান আছে। নানা জাতের, নানা বর্ণের বাহারী ফুলে ভরা সে বাগান দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

বাড়ির দক্ষিণদিকে, সামান্য দূরে স্যামসনের জাহাজঘাট। সেদিকটাতেই বৃদ্ধ তার শোয়ার ঘর বানিয়ে নিয়েছে। খাট পেতেছে জানালার কাছে, যাতে ইচ্ছেমত সাগর–জাহাজঘাট সব দেখতে পায়।

শুয়ে-বসে বন্দরের দিকে তাকিয়ে থেকেই দিন কাটে বৃদ্ধের, জাহাজের আসা-যাওয়া দেখে চুপচাপ। দেশ-বিদেশ ঘুরে যেদিন তার দুরান্দ বন্দরে ফিরে আসে, সেদিন বৃদ্ধের আনন্দের সীমা থাকে না।

আবেগে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়ে সে, বাতের ব্যাথার কথা ভুলে দেরুশেতকে সাথে নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে পায়ে পায়ে একেবারে জেটির কাছে এসে দাঁড়ায়।

দেরুশেতের শোয়ার ঘর বাড়ির পশ্চিমদিকে। বাগানটাও সেদিকেই। লেতিয়ারির সেবা-যত্নসহ সংসারের যাবতীয় কাজ একাই করে সে, অবসর সময়ে বাগান থেকে ফুল তুলে এনে ঘর সাজায়। নিজেও সাজে।

বাগানের নিচু পাঁচিলের ওপাশে একটা রাস্তা আছে, পাঁচিল ঘেঁষে সাগরের দিকে চলে গেছে। সেই রাস্তার শেষ মাথায় বড় এক পাথরের টিলা। গিলিয়াতের 'দৈত্যপুরী' ওটার ওপরেই।

লেতিয়ারি দুরান্দের দায়িত্ব যার হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তার নাম ক্লুবিন। যুবক কথা বলে খুব কম, কাজ করে বেশি। সৎ বলে যথেষ্ট সুনাম আছে তার এ অঞ্চলে।

চেহারা-সুরতে হিসেবী কেরাণী গোছের কিছু মনে হলেও যুবক আসলে একজন পাক্কা নাবিক। জলচর প্রাণীর মতই সুদক্ষ সাঁতারু সে। উত্তাল সমুদ্রে নির্ভয়ে সাঁতার কাটতে পারত ক্লুবিন। তার অন্তর্দৃষ্টিও ছিল ভীষণ তীক্ষ্ণ। বিশেষ করে এই গুনটির জন্যে লেতিয়ারি যুবককে বেশ পছন্দ করে।

একদিন এই যুবকই তাকে রাতাগের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, "রাতাগ লোকটাকে ভুলেও কখনও বিশ্বাস করবেন না দেখবেন, সুযোগ পেলে লোকটা একদিন চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে আপনার"।

অবশ্য এই জন্যেই যে লেতিয়ারি ক্লুবিনকে দুরান্দের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব দিয়েছে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। কথায় বলে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ডরায়। বিশ্বাসঘাতক রাতাগ পালিয়ে যাওয়ার পর কিছুদিন লেতিয়ারিরও সেই অবস্থা গেছে।

তাই ছেলেটাকে নিয়োগ দেয়ার আগে তার ব্যাপারে খুব ভাল করে খোঁজ-খবর নিয়ে তবেই দিয়েছে। বেশ কিছু ছোটখাট পরীক্ষাও করিয়ে নিয়েছিল সে তাকে দিয়ে। তার সবগুলোয় বেশ ভালভাবেই উৎরে গেছে ক্লুবিন।

পাঁচ

পথে-ঘাটে দেরুশেতের সঙ্গে অনেকবার চোখাচোখি হয়েছে গিলিয়াতের, কিন্তু কথা হয়নি কখনও। বড়দিনের দিন নির্জন পথে আবারও দু'জনের দেখা হয়ে যাওয়া এবং বরফের ওপর দেরুশেতের তার নাম লিখে রাখার ব্যাপারটা একেবারে হতচকিত করে তুলল গিলিয়াতকে।

এমন কিছু ঘটতে পারে, স্যামসনের কেউ ওকে নিয়ে মাথা ঘামায়, তা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সে। এটা যখনকার ঘটনা, দেরুশেতের বয়স তখন ষোল পুরো হয়েছে।

খুব চিন্তিত মনে সেদিন বাড়ি ফিরল গিলিয়াত। ভেবে পেল না, এই কন্‌কনে শীতের মধ্যে কি এমন জরুরি কাজে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল সে। বড়দিন বলে অন্যদের মত প্রার্থনা করতে গির্জায় যাবে বলে বেরিয়েছিল, ব্যাপারটা যদি সেরকম হত, কোন কথা ছিল না।

কিন্তু সে জন্যে তো বেরোয়নি সে, তাহলে কেন বেবিয়েছিল? কি কাজে? দিনটা আকাশ-পাতাল ভেবে পার করল গিলিয়াত। রাতে ঘুমাতে গিয়ে আবিষ্কার করল, ঘুম তার

চোখের ত্রিসীমানার ধারও ঘেঁষছে না। রাজ্যের যত আবোল-তাবোল চিন্তা জুড়ে বসে আছে মাথার মধ্যে। মায়ের কথা মনে পড়ল ওর, ঘরের কোণে রাখা সেই বাক্সটার কথা মনে পড়ল। আরও কত-শত ভাবনা আলোড়িত করল রাতভর, তার ইয়ত্তা নেই। পরদিন যখন ওর ঘুম ভাঙল, তখন কড়া রোদে ঘর ভরে গেছে।

***

কয়েকদিন পরের কথা। দেরুশেত ওর রুমে বসে পিয়ানোয় কি এক মিষ্টি সুর বাজাচ্ছে, এই সময় বাগানের দেয়ালের ওপাশের রাস্তা ধরে কোথাও যাচ্ছিল গিলিয়াত।

সুরটা কানে যেতেই সচেতন হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। বাগানের নিচু দেয়ালের ওপর দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে চোরা চোখে দেরুশেতকে খুঁজল সে, কিন্তু মেয়েটির দেখা পেল না।

ওইদিন থেকে কেমন এক নেশায় পেয়ে বসল যেন যুবককে। যখন তখন ওদের বাড়ির পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে অযত্নে বেড়ে ওঠা বড় এক ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়াত। দেরুশেতের দেখা পাওয়ার আশায় অপেক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একটুও ক্লান্তি অনুভব হত না গিলিয়াতের। ভাগ্য ভাল থাকলে মেয়েটিকে কোনদিন বাগানে ফুল তুলতে দেখতে পেত, অথবা আড়াল থেকে ভেসে আসা ওর মিষ্টি গলার গান শুনতে পেত। কোনও কোনও দিন আবার কিছুই ঘটত না, হতাশ মনে বাড়ি ফিরে যেত সে। ও বাড়ির বাগানে বড় একটা বেঞ্চ পাতা আছে, রোজ সন্ধের পর দেরুশেতকে নিয়ে সেটায় বসত বৃদ্ধ।

বিশ্রাম নিত, শরীর-মন ভাল থাকলে আদরের ভাইঝিকে নিজের জীবনের সংগ্রাম আর সুখ-দুঃখের কাহিনী শোনাত সে লম্বা সময় ধরে। গল্পে গল্পে রাত কখন গভীর হয়ে এসেছে, হুঁশ থাকত না তাদের কারও।

কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত না যে আরও একজন শ্রোতা আশেপাশেই আছে। লেতিয়ারির জীবন যুদ্ধের গল্প সে-ও শুনছে মুগ্ধ হয়ে।

এক রাতে শুতে যাচ্ছে দেরুশেত, এমন সময় দূর থেকে বাঁশির মন পাগল করা মিষ্টি সুর ভেসে আসতে শুনে কান খাড়া হয়ে উঠল ওর। আওয়াজটা গিলিয়াতের বাড়ির দিক থেকে আসছে না?

অবাক হলো দেরুশেত। কে ওই জাদুকর যে বাঁশিতে এমন হৃদয় নিংড়ানো সুর তুলতে পারে?

আশ্চর্য! পিয়ানোয় ও নিজে সাধারণত যে সুর তুলে থাকে, সেই সুরই তো! ভাবতে ভাবতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখার উপায় নেই। তন্ময় হয়ে বাঁশির সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

সেদিনের পর থেকে প্রায় রাতেই নিয়মিত শোনা যেতে লাগল সেই বাঁশি, বিশেষ করে অন্ধকার রাতে। কে বাজাত, জানে না দেরুশেত।

অচেনা, খেয়ালী বাদকের সেই মায়াবী, মিষ্টি সুর অন্ধকার রাতের বুকে কাঁপন ধরিয়ে একসময় ধীরে ধীরে বাতাসে মিলিয়ে যেত। আর কারও প্রাণে তা কোনরকম দোলা জাগাতে পারত কি না কে জানে! এভাবেই দেখতে দেখতে চার বছর পার হয়ে গেল। চার বছর একেবারে কম সময় নয়! দেরুশেত

কুড়িতে পা দিয়েছে, অথচ এতদিনেও ওর সাথে গিলিয়াতের একটা বাক্য বিনিময় পর্যন্ত হয়নি। ওকে নিয়ে দিনরাত কেবল কল্পনার জালই বুনে চলেছে যুবক।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল। গ্রামের সেইন্ট পিটার গির্জায় এক নতুন রেভারেন্ড এসেছে। বয়স অল্প, প্রায় গিলিয়াতের বয়সী। নাম কড্রে। আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় তার, তবে শিক্ষা-দীক্ষা ভালই আছে।

গেরানসির সবাই জানল, লন্ডনে তার এক মামা আছে। ভদ্রলোক খুব ধনী। ছেলে-মেয়ে বা আর কোন ওয়ারিশ নেই সে মামার, ভাগ্নে কড্রেই তার সমস্ত সহায়-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কাজেই মামার মৃত্যুর পর সে যে ধনী হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে প্রত্যেকে নিশ্চিত। যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তা এই রেভারেন্ডকে নিয়েই।

তার সেইন্ট পিটার গির্জার কাজে যোগ দেয়ার একদিন কি দু'দিন পর গিলিয়াত ওর খুদে নৌকাটা নিয়ে সাগরে বেরিয়েছিল মাছ ধরতে। সারাদিন মাছ ধরে সন্ধের আগে আগে দ্বীপে ফিরে যাচ্ছে ও।

'মহিষ পাহাড়ের' ধার দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ মনে হলো ওটার সিংহাসনের ওপর আবছামত একটা ছায়া যেন দেখা যাচ্ছে। এখন জোয়ারের সময়। গিলিয়াত ভাল করেই জানে এ সময় ওখানে থাকার মত দুঃসাহস এ তল্লাটের কারও থাকতেই পারে না। ওদিকে পানি বেড়ে ওঠায় 'মহিষ পাহাড়ে' যাওয়ার সরু পথটাও ততক্ষণে তলিয়ে গেছে।

কাজেই কোন জীব-জন্তুরও ওখানে থাকার সম্ভাবনা নেই এখন। এরকম বিপজ্জনক মুহূর্তের সময় তারাও ওই টিলার

ধারেকাছে ঘেঁষে না। কিন্তু কেউ যে 'মহিষ পাহাড়ে' আছে, তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না গিলিয়াতের।

দেরি না করে নৌকার গলুই সেদিকে ঘুরিয়ে দিল ও। কাছে গিয়ে দেখল সন্দেহ মিথ্যে নয়, সত্যিই কেউ একজন আছে। সিংহাসনে শুয়ে আছে। নড়াচড়া নেই, একদম নিথর।

এদিকে জোয়ারের পানি ততক্ষণে আরও ফুলে-ফেঁপে উঠে 'মহিষ পাহাড়কে' উপকূল থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা টিলাটাই সম্পূর্ণ তলিয়ে যাবে সাগরে।

মানুষটা যে-ই হোক, ওরকম অনড় শুয়ে আছে কেন ভেবে পেল না গিলিয়াত। মরে যায়নি তো ? কিন্তু দেখে সেরকম মনে হলো না ওর! বরং মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে।

নিশ্চিত হওয়া দরকার, কাজেই সময় নষ্ট না করে গায়ের জোরে নৌকা বেয়ে টিলার যতটা সম্ভব কাছে চলে এল সে, চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল লোকটাকে। কিন্তু অনেক ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না তার।

আগের মতই অসাড় পড়ে আছে। ওদিকে উন্মত্ত চ্যানেলের ভরা জোয়ারের পানি তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে 'মহিষ পাহাড়ের' চূড়াটাকে ঘিরে। লোকটার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল গিলিয়াত। এরকম সময় নৌকা নিয়ে টিলার বেশি কাছে যাওয়াও বিপদ, ঢেউয়ের আঘাতে ওটার ওপর আছড়ে পড়ে চোখের পলকে চুরমার হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু না গেলেও নয়, কিছুক্ষণের মধ্যে নির্ঘাত মরবে তাহলে লোকটা। কাজেই খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও, বিপদের ভয় একপাশে সরিয়ে রেখে টিলার দিকে এগোল।

ততক্ষণে ও নিশ্চিত বুঝে ফেলেছে মানুষটা যে-ই হোক, ঘুমিয়ে আছে। তাই সাড়া দিচ্ছে না। দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে দেখে মহাব্যস্ত হয়ে উঠল গিলিয়াত। টিলার আরও কাছে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে লোকটাকে চিনতে না পারলেও সে যে স্থানীয়, তেমনও মনে হলো না ওর।

তার পরনে পাদ্রিদের মত পোশাক। এর মধ্যে পানি 'মহিষ পাহাড়ের' চূড়ার এতই কাছে পৌঁছে গেছে যে নৌকার ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেই ও লোকটাকে ছুঁতে পারে।

জোয়ারের পূর্ণতা পেতে আর বেশি দেরি নেই, তাই পানির লাফ-ঝাঁপ সামান্য কমেছে বলে মনে হলেও খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারল না গিলিয়াত।

কারণ পানি বাড়লেও স্রোতের তেজ এখনও বলতে গেলে আগের মতই আছে, এই পরিস্থিতিতে সতর্ক না থাকলে বিপদ। যে কোন মুহূর্তে ওর সাধের ছোট্ট নৌকাটাকে টিলার ওপর আছড়ে ফেলে চুরমার করে দেয়ার মত যথেষ্ট ক্ষমতা এখনও রয়েছে চ্যানেলের।

তাই আরও সাবধানে এগোল গিলিয়াত, নৌকাটাকে বহুকষ্টে কোনমতে টিলার কয়েক হাতের মধ্যে নিয়ে এল। তারপর ওটাকে আড়াআড়িভাবে রেখে এক পা নৌকায়, আরেক পা টিলার সাথে ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে। নৌকা যাতে গ্র্যানিটের দেয়ালে বাড়ি না খায়, সেদিকে কড়া নজর।

সামলে নিয়ে ঘুমন্ত লোকটার পা ধরে টান দিল গিলিয়াত। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসল সে, পরমুহূর্তে নিজের চারদিকে পানির অস্বাভাবিক বিস্তার দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল একেবারে।

'এই যে, মঁশিয়ে!' গলা চড়িয়ে ডাকল ও। 'কে আপনি? এই অসময়ে এখানে কি করছেন?'

ভয়ে বিস্ফারিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল লোকটা, ওর প্রশ্ন শুনে হড়বড় করে বলতে লাগল, 'দেখুন, মঁশিয়ে! আমি এই দ্বীপে নতুন। সব জায়গা ঠিকমত চিনি না। আজ দ্বীপটা ঘুরে দেখতে এসে এই জায়গাটা ভাল লেগে গেল বলে একটু বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম। সমুদ্রযাত্রায় খুব ক্লান্ত ছিলাম কি না, তাই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টেরই পাইনি।'

'তা তো বুঝলাম,' বলল গিলিয়াত। 'কিন্তু এটা কোন ঘুমানোর জায়গা হলো? আর কয়েক মিনিট এভাবে থাকলে যে ঘুমটা চিরস্থায়ী হয়ে যেত আপনার! জোয়ারের পানি টিলা ডুবিয়ে দিতে বসেছে দেখছেন না?'

গিলিয়াতের নৌকার পাটাতনে কিছু মাছ দেখতে পেয়ে লোকটা ওকে জেলে ভেবে নিল। কিন্তু এই ভরা জোয়ারের সময় এতটুকুন এক নৌকা নিয়ে মানুষ কিভাবে বিক্ষুব্ধ সাগরে যেতে সাহস করে, ভেবে ভারী অবাক হলো সে। অথচ মাঝি লোকটা কি নির্বিকার, আমলই দিচ্ছে না ব্যাপারটাকে।

'হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' বলল লোকটা। 'কিন্তু আপনিই বা এই অসময়ে কোত্থেকে এলেন?'

'সে সব পরে শুনলেও চলবে,' লোকটার দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল গিলিয়াত। 'আমার হাত ধরুন। তাড়াতাড়ি উঠে আসুন নৌকায়।'

তাকে কোনমতে তুলে নিল ও, তারপর গ্র্যানিটের দেয়ালে বৈঠা দিয়ে জোর এক গুঁতো মেরে ওটার কাছ থেকে সরে এল, গলুই ঘুরিয়ে নীরবে উপকূলের দিকে চলতে শুরু করল। অল্প

সময়ের মধ্যে লোকটাকে নিয়ে তীরে পৌঁছে একটা খুঁটির সাথে নৌকা বাঁধার জন্য উঠল গিলিয়াত।

এমন সময় চোখের কোনে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঘুরে তাকিয়ে দেখল, লোকটা তার পরনের যাজকদের মত ঢোলা, কালো পোশাকের পকেট থেকে একটা গিনি বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে আছে। হাতটা সরিয়ে দিয়ে নীরবে নৌকা বাঁধতে লাগল গিলিয়াত।

ওর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল আগন্তুক, তারপর মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'দেখুন, মঁশিয়ে, আজ আপনি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আপনি না থাকলে ... '

'হতে পারে,' নির্বিকার চেহারায় জবাব দিল ও।

'সে জন্যে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, মঁশিয়ে। এতবড় একটা ঋণ শোধ করার '

'ঋন? সে তো কখন শোধ হয়ে গেছে,' বাধা দিয়ে বলে উঠল গিলিয়াত। অন্যমনস্ক।

'কিন্তু আপনার তো অনেক কষ্ট হয়েছে!'

'তা হয়েছে। কিন্তু নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে হলে ওটুকু যে আমাকে করতেই হতো!' পাশাপাশি হেঁটে চলল গিলিয়াত ও রেভারেন্ড কড্রে, কথা নেই কারও মুখে। আগন্তুকই মুখ খুলল একটু পর।

'আপনি এই গ্রামের লোক?' সঙ্গীকে ভাল করে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'না।'

'তাহলে?'

হাত তুলে আকাশ নির্দেশ করল গিলিয়াত। 'ওই যে, ওখানকার।'

আর কোন প্রশ্ন করল না লোকটা, অবাক চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পথে চলে গেল। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে কি খেয়াল হতে ফিরে এল সে। পকেট থেকে চামড়ায় বাঁধানো একটা ছোট, সুদৃশ্য বই বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'এই বইটা আপনাকে উপহার দিতে চাই আমি। নিতেই হবে আপনাকে।'

আপত্তি না করে হাত বাড়াল গিলিয়াত। বুঝল ওটা একটা বাইবেল। জীবন রক্ষাকারীর হাতে বইটা তুলে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল রেভারেন্ড। আনমনে তার গমণপথের দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

ছয়

সেইন্ট ম্যালো ফ্রান্সের এক উপকূলীয় বন্দর। স্যামসন থেকে প্রতি মঙ্গলবার দুরান্দ বোঝাই করে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে এখানে আসে ক্লুবিন। দু'দিন থেকে বয়ে আনা মালপত্র খালাস করে, তারপর নতুন পণ্য নিয়ে শুক্রবার স্যামসনে ফিরে যায়।

সেইন্ট ম্যালো জাহাজ ঘাটের কাছেই একটা হোটেল আছে। সেটার একটা রুম লেতিয়ারির জাহাজ কোম্পানির অফিস

হিসেবে ব্যবহার হয়। দুরান্দের শাখা অফিস। ক্লুবিন এলে সেই রুমেই থাকে।

হোটেলটার ডাইনিং রুমে দু'টো বড় টেবিল আছে, একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট, অন্যটা শুল্ক বিভাগের অফিসার ও সাধারণ নাবিকদের জন্যে। সেদিন দুই টেবিলেরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কয়েক ঘণ্টা আগে বন্দরে নোঙর করা তামোলিপা নামের এক আমেরিকান জাহাজ এবং সেটার ক্যাপ্টেন জুয়েলা।

কিছুদিন পর পর দেখা মেলে লোকটার। ব্যবসার কাজে তার জাহাজ ফ্রান্সের বিভিন্ন উপকূলীয় বন্দরে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে। সেইন্ট ম্যালো বন্দরে সম্ভবত এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ক্যাপ্টেন জুয়েলাকে চেনে না।

কারও অজানা নেই অল্পদিনেই প্রচুর কাঁচা টাকা-পয়সার মালিক বনে গেছে সে ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে দু'নম্বরী কারবার করে। মানুষ পাচারের ধান্ধা করে থাকে ক্যাপ্টেন জুয়েলা। ক্লুবিনও চিনত জুয়েলাকে, কিন্তু কখনও আলাপ হয়নি তাদের দু'জনের।

পুলিসের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা চরমপন্থী রাজনীতিক অথবা পাওনাদারদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো দেউলিয়া বা পুলিসের তাড়া খাওয়া খুনী-ডাকাত, অথবা অন্য যে কোন অপরাধেই অপরাধী হোক না কেন, দেশ ছেড়ে কারও পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে তাকে সাহায্য করতে জুয়েলা সব সময় এক পায়ে খাড়া।

তামোলিপার খোলের মধ্যে পুরে তাকে সবার চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদে পাচার করে দেবে সে, বিনিময়ে দিতে হবে

মোটা অঙ্কের টাকা। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে উপকূলের নির্দিষ্ট কোন এক নির্জন, গোপন জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে হয় তাদেরকে। পরে সময়মত বন্দর ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে জাহাজের লাইফবোট পাঠিয়ে তাদেরকে তুলে নেয় জুয়েলা। কুকর্মটা বন্দর থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে সারা হয় বলে ফরাসী কাস্টমস, উপকূল রক্ষী পুলিস বা গোয়েন্দারা হাতেনাতে ধরতে পারে না লোকটাকে।

অনেকের মতে গত সফরের সময়ও নাকি এরকম দু'জনকে নিয়ে গেছে জুয়েলা। এবারও তার একই প্ল্যান আছে। বিরাট দাঁও মারতে যাচ্ছে এবার সে।

তবে পুলিস কি ভাবে যেন আগেভাগেই টের পেয়ে গেছে ব্যাপারটা। কড়া নজর রেখেছে তারা ক্যাপ্টেন জুয়েলার ওপর। গোয়েন্দারাও সদাসতর্ক—এবার পাকড়াও করবেই তাকে।

ওদিকে এবারের মত তামোলিপায় মালপত্র বোঝাই দেয়ার কাজ পুরোদমে চলছে, আর ক'দিনের মধ্যেই সেইন্ট ম্যালো ছেড়ে যাবে ওটা।

মঙ্গলবার শেষ বিকেল। আঁধার ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। সূর্য ডুবতে আর বেশি দেরি নেই। এই সময় দুরান্দ এসে নাক ঢোকাল সেইন্ট ম্যালো হারবারে। ওটার ফোর ডেকে দাঁড়িয়ে আছে তখন ক্যাপ্টেন ক্লুবিন, নাবিকদেরকে এটা-সেটা নির্দেশ দিচ্ছে।

ওরই মাঝে তীরের দিকে চোখ গেল তার। দেখতে পেল বন্দর থেকে বেশ খানিকটা দূরে, নির্জন সাগরতটে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক—কথা বলছে। যথেষ্ট দূরে রয়েছে বলে তাদের ঠিকমত দেখা যায় না ঠিকই, কিন্তু ভাবভঙ্গী দেখে

স্পষ্ট বোঝা যায় জরুরি কোন বিষয় নিয়েই আলোচনা চলছে লোক দু'টোর মধ্যে।

সন্দেহ হলো ক্লুবিনের। এরকম অসময়ে বন্দর থেকে এত দূরে, নির্জন জায়গায় কারা ওরা? এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে? দূরবীন তুলে চোখে লাগাল সে, অমনি একলাফে অনেক কাছে চলে এল দৃশ্যটা।

আঁধার হয়ে এলেও প্রথম দর্শনেই দু'জনের একজনকে চিনে ফেলল সে। লোকটা ক্যাপ্টেন জুয়েলা। দ্বিতীয়জনের দিকে নজর দিল ক্লুবিন, একভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হলো তাকেও যেন চেনা চেনা লাগছে।

বেশ বয়স্ক মানুষ সে, তবে যথেষ্ট শক্তপোক্ত দেহের অধিকারী। দেখলেই বোঝা যায় এই বয়সেও দেহে প্রচুর শক্তি ধরে মানুষটা।

বন্দরে নেমে প্রথমেই তামোলিপা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিল ক্লুবিন। জানা গেল আরও দশদিন থাকবে ওটা সেইন্ট ম্যালোয়, তারপর ছেড়ে যাবে।

নিয়মমাফিক পরের শুক্রবার মালপত্র নিয়ে স্যামসনে ফিরে এল দুরান্দ। মাল খালাসের কাজ শুরু হলো। একসময় রাত নামল দ্বীপে। রাত একটু গভীর হতে ক্যাপ্টেন ক্লুবিন তৎপর হলো। একটা কম্পাস, একটা দূরবীন এবং সাথে কিছু বিস্কিট ইত্যাদি একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে সবার অলক্ষে জাহাজ থেকে নেমে এল সে। বন্দর এলাকা ছাড়িয়ে এসে উপকূল রেখা ধরে জোর পায়ে হেঁটে চলল অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে। ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে চলার পর উপকূলের কাছাকাছি ছোট, নির্জন এক গ্রাম, প্লাইমোয় এসে পৌছল যুবক।

খুব ছোট আর জনবিরল গ্রাম প্লাইমো, স্যামসনের কয়েক মাইল দূরে। হাতে গোনা কয়েক ঘর জেলে ছাড়া আর কেউ থাকে না সেখানে। রাত নামতে না নামতেই চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে গ্রাম।

এই গ্রামের এক মাথায়, সাগরের তীরে পুরানো আমলের একটা পোড়োবাড়ি আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে নির্ভয়ে সেই বাড়িটায় ঢুকে পড়ল ক্লুবিন, ব্যাগটা ভেতরে কোথাও রেখে একটু পরই আবার বেরিয়ে এসে ধীর পায়ে স্যামসনে ফিরে চলল। সে সময় অন্যমনস্ক লাগছিল তাকে। কোন গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল হয়তো।

যে পোড়োবাড়িতে গিয়েছিল ক্লুবিন, সেটা আসলে স্থানীয় চোরাচালানীদের প্রধান আড্ডাখানা। এখান থেকেই পরিচালিত হয় এ অঞ্চলের যত নিষিদ্ধ ও চোরাই মালামালের আমদানী-রফতানীর ব্যবসা।

বাড়িটার ছাদ থেকে তাকালে উপকূল থেকে সাগরের এক মাইল ভেতরের হ্যানওয়ে পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায়। গোটা অঞ্চলে ভীষণ কুখ্যাতি আছে হ্যানওয়ের। শোনা যায়, এমন কোন কুকর্ম নাকি নেই যা ওখানে ঘটে না।

অনেক গুহা আছে হ্যানওয়েতে—জোয়ারের সময় পানির নিচে তলিয়ে যায়, ভাটার সময় আবার জেগে ওঠে। স্থানীয়দের বিশ্বাস, ভাল করে খুঁজে দেখলে ওইসব গুহায় মানুষের প্রচুর কঙ্কাল পাওয়া যাবে।

চ্যানেলের মাঝখানে ছোট ছোট তিনটা পাহাড় নিয়ে হ্যানওয়ে। কত জাহাজ যে ওগুলোর সাথে ধাক্কা খেয়ে তলিয়ে গেছে চ্যানেলের অতল গভীরে, তার কোন লেখাজোখা নেই।

হ্যানওয়ে থেকে চ্যানেল সাঁতরে তীরে পৌছানো একেবারে অসাধ্য না হলেও খুবই যে দুঃসাধ্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্লুবিনের কাছে সেটা কোন সমস্যাই নয়।

যে সমস্ত পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে পাশ করার মধ্যে দিয়ে ক্লুবিন লেতিয়ারির মন জয় করতে পেরেছিল, হ্যানওয়ে থেকে সাঁতরে তীরে পৌছানো ছিল তার একটি।

পরের মঙ্গলবার যথারীতি সেইন্ট ম্যালোয় পৌছল দুরান্দ। জাহাজ ভিড়িয়ে হোটেলে চলে এল ক্লুবিন, হোটেল মালিককে তামোলিপা সম্পর্কে এটা-সেটা প্রশ্ন করতে লাগল।

সে রাতে রীতিমত একটা অঘটন ঘটিয়ে বসল ক্যাপ্টেন ক্লুবিন, ডিনারের পর দেখা গেল অফিসে নেই সে। হোটেলেও নেই। কোথায় গেছে, কেউ জানে না। কাউকে বলে যায়নি। এমন তো কখনও ঘটে না!

বন্দরের যে সব জায়গায় সে যায় বা যেতে পারে, সে সব জায়গা ভাল করে খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। নেই তো নেই-ই লোকটা। তার জন্যে জাহাজের মালপত্র খালাসের আগে ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধ করাসহ আর যে সব নিয়ম পালন করা জরুরি, সেসবের কোনটাই সেদিন ঠিকমত পালিত হলো না।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, ক্লুবিনের মত দায়িত্বশীল একজন ক্যাপ্টেনের এতবড় গাফিলতি চিন্তাই করা যায় না। অবশ্য রাতেই হোটেলে ফিরে এল সে।

কিন্তু অনুপস্থিতির সময়টায় কোথায় ছিল ক্লুবিন, সে ব্যাপারে কাউকেই কিছু বলল না লোকটা। সম্পূর্ণ চেপে গেল। পরদিন জানা গেল, আগের রাতে সেইন্ট ম্যালোর এমন এক প্রতিষ্ঠানে

তাকে দেখা গেছে, যারা বিভিন্ন দেশের টাকা-পয়সা অদল-বদলের ব্যবসা করে। বন্দরের একমাত্র আগ্নেয়াস্ত্রের দোকানেও নাকি গিয়েছিল সে।

***

তামোলিপার বন্দর ছাড়ার দিনকার ঘটনা।

জেটির কিছুটা দূর দিয়ে ছোট ছোট পাহাড়ের মত দেখতে এক সারি পাথরের টিলা সোজাসুজি সাগরের অনেকটা ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে, দূর থেকে ওগুলোকে দেখতে লাগে ঠিক একটা বর্শার মত।

সঙ্কীর্ণ একটা পাথর খণ্ড এই বর্শার সাথে তীরের সংযোগ রক্ষার কাজ করছে। বর্শার মাথা আর সব পাহাড়ের চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু এবং চওড়া।

সেখান থেকে আরেকটা পাথর বের হয়ে অনেকটা বাড়িয়ে দেয়া হাতের মত আড়াআড়িভাবে চলে গেছে একদিকে। সব মিলিয়ে চমৎকার, মনোরম একটা পরিবেশ। কিন্তু সাগরের বেশ খানিকটা ভেতরে এবং খুব নির্জন বলে এখানে কেউ তেমন একটা আসে না।

তবে সেদিন বিকেল চারটার দিকে একজনকে দেখা গেল সেখানে। একা। বর্শার মাথায় দাঁড়িয়ে দূরবীন চোখে লাগিয়ে একভাবে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় আছে।

পরনে সৈনিকের পোশাক। এবং সে যে সশস্ত্র, তা-ও বুঝতে অসুবিধে হয় না। লোকটা একজন উপকূল রক্ষী। বিশেষ এক গোপন খবর পেয়ে এখানে এসেছে। এক সময় তার প্রতীক্ষার অবসান হলো। অনেক দূরে, আকাশ যেখানে সাগরের সাথে

মিশেছে, সেখানে বিশাল নীল চাদরের ওপর কালো ফোঁটার মত একটা বিন্দুর দেখা পেল লোকটা। বিরক্তিকর লম্বা সময় নিয়ে একটু একটু করে বড় হচ্ছে সেটা। সেইন্ট ম্যালোর দিকেই আসছে।

একটা জাহাজ! দম বন্ধ করে একভাবে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রক্ষী লোকটা। দুনিয়ার আর কোনদিকে খেয়াল নেই।

পিছন থেকে কতবড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে, ঘুণাক্ষরেও টের পেল না লোকটা। জানতেও পারল না পাহাড়ের গা বেয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। একভাবে সামনে তাকিয়েই থাকল। বেশ খানিকক্ষণ পর যখন বুঝল বিন্দুটা সত্যিই বড় হচ্ছে, হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

এর কারণ আছে, তার গোপন সংবাদ ফলতে শুরু করেছে। ওটা তামোলিপা। বন্দর ছেড়ে গন্তব্যের পথে যাত্রা করেছিল ঘণ্টা দুয়েক আগে, এখন আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল গার্ড।

ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে শুরু করেছে বিন্দুটা, এখন জাহাজটাকে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রক্ষী। গতি কমে আসতে শুরু করেছে ওটার। কমতে কমতে এক সময় থেমেই পড়ল তামোলিপা।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে লাগল। একটা ছোট নৌকা সাগরে নামানো হলো সেটা থেকে, কয়েকজন যাত্রী নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ওটার যাত্রীদের চেহারা-সুরত, আচরণ খুবই সন্দেহজনক।

একটু পর জাহাজ থেকে আলাদা হয়ে এদিকেই আসতে শুরু করল ওটা। উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল উপকূল রক্ষী

লোকটা, বারবার পা বদল করতে লাগল। চোখ থেকে দূরবীন না সরিয়েই এক পা এক পা করে বর্শার একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়াল সে। মাত্র এক হাত সামনেই যে খাড়া তীর, নিচে উন্মত্ত সাগর, সে কথা ভুলেই গেছে বোধহয়।

পিছনের লোকটা যেন এরকম এক মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। চোখ দু'টো মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল তার। মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েই দু'জনের মাঝখানের বাকি হাত কয়েকের ব্যবধান এক লাফে পেরিয়ে এল সে, তারপর পিছন থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল লোকটাকে।

মরার আগে চিৎকার করারও সময় পেল না রক্ষী, খাড়া কিনারা থেকে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে অনেক নিচের সাগরে পড়েই তলিয়ে গেল সে। দূরবীনটা পড়ে থাকল জায়গায়।

এদিকে সাফল্যের বীভৎস আনন্দে বিকট হাসিতে ফেটে পড়ল হত্যাকারী। কিন্তু হাসিটা পুরো করতে পারল না সে, তার আগেই পিছনে এক জোড়া পায়ের চাপা শব্দ উঠল। গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে উঠল কে যেন, 'হ্যালো, রাতাগ!'

চমকে উঠে ঘুরে তাকাল প্রথমজন। মাত্র কয়েক হাত পিছনে ছোটখাট এক যুবককে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চোখ কুঁচকে উঠল তার। এক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই আবার হেসে উঠল সে, পিস্তলধারীকে চিনতে পেরেছে।

'ক্লবিন!'

'চিনতে পেরেছ তাহলে?'

'পারিনি আবার?' তিক্ত, কিছুটা বিরক্ত কণ্ঠে বলল বয়স্ক লোকটা। 'খুব চিনেছি!'

সাগরের দিক থেকে দ্রুত দাঁড় টানার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তীরের মাথার কাছে এসে পড়েছে নৌকা। ওটার যাত্রীদের চড়া গলার কথাবার্তার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। তাদের গলা শুনেই বোধহয় কিছুটা ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখা গেল রাতাগকে।

'আমার কাছে কি চাও তুমি, ক্লুবিন?' বলল লোকটা।

'কি চাই?' বাঁকা হাসি ফুটল ক্লুবিনের মুখে। 'তেমন কিছু না।' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল। 'আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল বোধহয় দশ বছর আগে, তাই না? তা আছ কেমন?'

'ভাল। তুমি?'

'আমিও ভালই আছি,' কথার ফাঁকে লোকটা এক পা এগিয়ে এসেছে দেখে পিস্তল ধরা ডান হাত একটু উঁচু করল ক্লুবিন। 'সাবধান, রাতাগ! আমাদের মাঝের দূরত্ব যা আছে তাই থাকুক, কমাবার চেষ্টা কোরো না। সুবিধে করতে পারবে না। দেখতেই পাচ্ছ আমার পিস্তল আছে।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। চেহারার রং বদলে যেতে শুরু করেছে, পিস্তল আর যুবকের দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। 'কি চাও তুমি?' বলল সে। 'বলে ফেলো, আমার একটু তাড়া আছে।'

'বললাম না তেমন কিছু না! তোমার সাথে একটু গল্প করতে চাই!' একটু বিরতি দিল যুবক। 'তুমি এইমাত্র একজন উপকূল রক্ষীকে সাগরে ফেলে দিয়েছ, রাতাগ। আমার মনে হয় এতক্ষণে মরে গেছে লোকটা।'

জবাব দিল না রাতাগ। বেশ কিছু সময় নীরবে তাকিয়ে থাকল ক্লুবিনের মুখের দিকে, তারপর হেসে প্রশংসার সুরে

বলতে লাগল, 'এত বছর পর পিছন থেকে নিজের আসল নামের ডাক শুনেই আমি বুঝেছি এ তুমি ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। আমাকে কি করে চিনলে তুমি?' সন্তর্পণে আবারও দু'পা এগোল সে কথার ফাঁকে। 'আমি এখানে আছি, সে কথা জানলে

'রাতাগ!' শীতল গলায় হুমকি দিল ক্লুবিন। 'যেখানে ছিলে পিছিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াও, যদি বাঁচতে চাও।'

দ্রুত নির্দেশটা পালন করল বৃদ্ধ। পিছিয়ে গিয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকল যুবকের দিকে।

'শোনো, রাতাগ,' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে নিল দুরান্দের ক্যাপ্টেন। তারপর যেন কোন তাড়া নেই, এমন ধীরস্থির, শান্ত গলায় বলল, 'এখান থেকে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে, তোমার ডানদিকে আরেকজন কোস্ট গার্ড আছে। আর বন্দরের কাস্টমস কালেক্টরেটের অফিসটাও খুব বেশি দূরে নয়। ওখানে কতজন গার্ড আছে কে জানে!

'আমি যদি পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ করি, হুড়মুড় করে ছুটে আসবে সবাই। সে ক্ষেত্রে যে গার্ডটাকে এইমাত্র তুমি সাগরে ফেলে খুন করেছ, তার লাশ খুঁজে পেতে একটুও দেরি হবে না ওদের। কাজেই বুঝতেই পারছ কি কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছ তুমি!'

'হ্যাঁ, পারছি,' শুকনো মুখে মাথা ঝাঁকাল সে। 'বেশ, বলো কি চাও তুমি।'

'বলছি,' মৃদু হাসি ফুটল যুবকের মুখে। বিজয়ীর হাসি। 'মন দিয়ে শোনো। তোমার পরনের পাজামাটার দু'টো পকেট আছে। তার একটায় আছে তোমার প্রিয় ঘড়িটা, ওটা যত্ন করে

রেখো কিন্তু।'

'রাখব, ধন্যবাদ। আর কি?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ক্লুবিন, হাসছে। 'বলছি, বলছি! এত ব্যস্ত হলে কি চলে নাকি? আর তোমার দ্বিতীয় পকেটে লোহার পাতের তৈরি একটা মানিব্যাগ আছে। স্প্রিঙের সাহায্যে খোলে ওটা, ঠিক?'

'হ্যাঁ, ঠিক।' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল বৃদ্ধের।

'ওটা বের করো।'

'কেন?' ঢোক গিলল সে।

'ওটা আমার চাই, তাই। দাও, এদিকে ছুঁড়ে দাও ওটা।'

দেখতে দেখতে চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল লোকটার, রেগে উঠেছে। 'ও! এই জন্যেই তুমি এ যে দেখছি রীতিমত ডাকাতি!'

'তাই বুঝি?' হাসল যুবক। 'ডাকাতি? তা বেশ তো! কোস্ট গার্ডরা বেশি দূরে নেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে সেদিক দেখাল। 'তাহলে আর দেরি করছ কেন? ডাকো না তাদের! এসে তোমাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাক।'

অবস্থা বেগতিক দেখে আপোষে আসার চেষ্টা করল বৃদ্ধ। সুর নরম করে বলল, 'ঠিক আছে, ক্লুবিন। এসো, একটা রফা করি আমরা। আমার মানিব্যাগে যত টাকা আছে, তার অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

'উহুঁ,' মাথা নাড়ল যুবক। 'অর্ধেকে চলবে না, পুরো টাকা চাই আমার। কারণ ওই টাকাগুলো চুরির টাকা। ওগুলোর ওপর তোমার কোন অধিকার নেই।'

রেগে উঠল সে। 'আমি চোর! আর তুমি বুঝি খুব সাধু?'

দু'চোখ জ্বলে উঠল যুবকের। চড়া কণ্ঠে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি সাধু। এ অঞ্চলের যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখো, সে-ই বলবে দুরান্দের ক্যাপ্টেন ভাল মানুষ। সৎ। আর রাতাগ একটা বিশ্বাসঘাতক।

'যাক্‌গে সে সব। দশ বছর আগের এক রাতের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চই? যে রাতে তুমি লেতিয়ারির সিন্দুক খালি করে সমস্ত টাকা-পয়সা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলে! মনে পড়ে?

'তোমার নিজেরও কিছু টাকা ওর মধ্যে ছিল ঠিকই, কিন্তু লেতিয়ারির ছিল পুরো পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। দশ বছরে সেই পঞ্চাশ হাজারের সুদ আসে আরও পঁচিশ হাজার, তার মানে সব মিলিয়ে টাকাটা দাঁড়াল পঁচাত্তর হাজারে।

'কাল রাতে তুমি যখন বন্দরের টাকা বদলকারীর অফিসে গিয়েছিলে, তখন সেখানে তোমার চেনা এক লোকও ছিল। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করোনি তুমি। যা হোক্, যখন তুমি ওই অফিস থেকে টাকা বদল করে বেরিয়ে এলে, তখন তোমার ব্যাগে পনেরো হাজারের পাঁচটা নোটে পঁচাত্তর হাজারসহ আরও কিছু খুচরো ফ্রাঁ ছিল। কাল বোধহয় খুব বেশি তাড়া ছিল তোমার, তাই না, রাতাগ?'

'তাই কেউ একজন যে অন্ধকারে তোমাকে সারাক্ষণ অনুসরণ করেছে, খেয়ালই করোনি। অবশ্য তোমার তাড়া থাকারই কথা।

'তামোলিপার বন্দর ছেড়ে যাওয়ার সবকিছু ঠিকঠাক, তোমাকে সেটায় যে করে হোক উঠতেই হবে। কাজেই আমি অন্তত এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখি না।'

একটু থামল ক্লুবিন, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রাতাগের দিকে। মনে মনে ওজন করছে লোকটাকে। রাতাগও দেখছে তাকে। চেহারায় পরাজয়ের লক্ষণ সুস্পষ্ট।

'কয়েকদিন আগে সী-বীচে ক্যাপ্টেন জুয়েলার সাথে আলাপ করছিলে তুমি,' আবার বলতে শুরু করল ক্লুবিন। 'নিশ্চই পালাবার ফন্দি-ফিকির পাকা করছিলে? দেখো, সে খবরও কিন্তু অজানা নেই আমার। তার সাথে তোমার যে একটা গোপন চুক্তি হয়েছে, তাও জানা আছে। কি বলো, অবাক হলে?'

সাগরের দিক নির্দেশ করল ক্লুবিন। 'ওই তো তোমার সাধের তামোলিপা দাঁড়িয়ে আছে, মাস্তুল দেখা যাচ্ছে ওটার। তোমার জিনিসপত্র তো আগেই তোলা হয়ে গেছে ওটায়, তাই না? চুক্তি অনুযায়ী নৌকা নিয়ে জুয়েলার লোকজনও তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে।

মাথা নাড়ল সে। 'কিন্তু তোমার দুর্ভাগ্য যে তুমি যেতে পারছ না। যতক্ষণ না আমি তোমাকে যেতে দিচ্ছি। এতক্ষণে তা নিশ্চই বুঝে ফেলেছ! কি বলো, পারছ না?'

হাসল ক্লুবিন। 'মনে তো হয় পারছ। তা তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, রাতাগ। কিন্তু যদি যেতে চাও, তাহলে যা বলি তাই করতে হবে তোমাকে। লেতিয়ারির খোয়া যাওয়া টাকার খোঁজ এত বছর যখন পেলামই, তখন তার কর্মচারী হিসেবে ওগুলো উদ্ধার করা আমার দায়িত্ব।

'দাও, দিয়ে দাও টাকাটা। মানিব্যাগ পকেট থেকে বের করে ছুঁড়ে দাও এদিকে। কিন্তু খবরদার! কোনরকম চালাকি করতে

যেয়ো না যেন। চালাকি করে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না তুমি।'

যুবকের নির্দেশ পালন করা ছাড়া কিছু করার উপায় নেই দেখে কিছুক্ষণ অসহায় রাগে ফুঁসল রাতাগ। ভারী মানিব্যাগটা বের করে হতাশ চেহারায় উল্টে-পাল্টে দেখল কিছু সময়, তারপর ছুঁড়ে দিল সেটা।

ক্লুবিনের পায়ের কাছে এসে পড়ল মানিব্যাগ। পিস্তল ধরা হাত এবং নজর লক্ষ্যে স্থির রেখে একটু ঝুঁকে অন্য হাতে ওটা তুলে নিয়ে মৃদু হাসল।

'ধন্যবাদ! আরেকটু কষ্ট করো, পিছন ফিরে দাঁড়াও।'

টাকা হারানোর শোকে কাতর হলেও দেরি না করে সুবোধ বালকের মত তার নির্দেশটা পালন করল রাতাগ, গ্রচণ্ড ক্ষোভে চোখমুখ বিকৃত ঘুরে দাঁড়াল। এই ফাঁকে স্প্রিঙে চাপ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি ব্যাগটা খুলল ক্লুবিন, ভেতরে চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল। আছে টাকাগুলো।

লেতিয়ারির পঁচাত্তর হাজার তো আছেই, বরং আরও কিছু বেশিই আছে। প্রতিটা পনেরো হাজার মূল্যমানের মোট পাঁচটা নোট রেখে বাকি টাকাগুলো ব্যাগ থেকে বের করল ক্লুবিন, বন্ধ করল ওটা।

'ঠিক আছে, রাতাগ। এবার এদিকে ফিরে দাঁড়াতে পারো।'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াতে আবার বলল, 'তোমাকে আগেই বলেছি আমি কেবল লেতিয়ারির প্রাপ্য পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁ চাই। তার এক পয়সাও বেশি চাই না। এই নাও বাকিটা।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা এক খণ্ড পাতলা টিন দিয়ে নোটগুলো মুড়ে রাতাগের দিকে ছুঁড়ে মারল সে। গড়িয়ে

গড়িয়ে তার পায়ের কাছে গিয়ে থামল দলাটা। নিরাসক্ত চোখে সেদিকে একপলক তাকাল বৃদ্ধ, তারপর এক লাথিতে সাগরে ফেলে দিল সব টাকা।

'যাক, তোমার টাকা-পয়সার বিশেষ প্রয়োজন নেই দেখে খুশি হলাম,' ক্লুবিন বলল। 'বোঝা যাচ্ছে নিজের অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটিয়েছ তুমি এই ক'বছরে, কি বলো? তবে আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি।

'তোমার ভাগ থেকে এক ফ্রাঁ-ও নিইনি আমি। এবার যাও তাহলে, রাতাগ। তামোলিপার ক্রুদের কথা শোনা যাচ্ছে, ওরা তোমার দেরি দেখে অস্থির হয়ে পড়েছে মনে হয়। যাও, রাতাগ। বিদায়।'

শেষবারের মত কিছুক্ষণ আগুনঝরা চোখে ক্লুবিনের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পাথরের বাড়ানো হাত ধরে শ্লথ গতিতে হাঁটতে লাগল। আর একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

এক সময় চোখের আড়ালে চলে গেল সে, আরও খানিক পর পানিতে বেশ কয়েকটা বৈঠার ঝপাঝপ্ শব্দ শুনতে পেল ক্লুবিন। নিহত গার্ডের দূরবীনটা কাছেই পড়ে থাকতে দেখে কাছে গিয়ে সেটা তুলে নিল।

ওটা চোখে লাগিয়ে নৌকাটার দিকে তাকাল। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে বেশ দ্রুত গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে ওটা। একটু পর চ্যানেলের গর্জন ছাপিয়ে একটা কণ্ঠস্বর কানে এল তার।

'ভণ্ড ক্লুবিন! তুমি যে কত ভাল মানুষ, তা আমার জানা আছে। ওই টাকা তুমি লেতিয়ারিকে কেমন ফেরত দেবে, তাও

বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি তোমাকে এত সহজে রেহাই দেবো না, ক্লুবিন! লেতিয়ারিকে সব জানিয়ে চিঠি দিচ্ছি আমি। এই নৌকায় গেরানসির একজন নাবিক আছে, সে সাক্ষী দেবে, আমি তার সমস্ত টাকা সুদে-আসলে তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি। ওই টাকা তুমি কোনদিনও হজম করতে পারবে না।'

কণ্ঠস্বরটা কার, বুঝতে বাকি রইল না ক্লুবিনের।

***

সেদিন অনেক রাতে হোটেলে ফেরার পথে কি মনে করে বাজার থেকে নামী কোম্পানির তৈরি বেশ দামী এক বোতল ব্র্যান্ডি কিনে নিয়ে এল ক্লুবিন। কেউ যাতে দেখে না ফেলে, সে জন্যে বোতলটাকে কোটের নিচে ভরে বেশ সতর্কতার সাথে হোটেলে ঢুকল।

অবশ্য রাত তখন বেশ গভীর বলে দেখার মত তেমন কেউ ছিলও না। ফিরেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

পরদিন গেরানসির পথে যাত্রা করবে দুরান্দ, সে জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি রাতেই নিয়ে রাখতে হবে তাকে।

সাত

গেরানসির দক্ষিণে ছোট একজোড়া পাহাড় আছে, চ্যানেলের মাঝামাঝি জায়গায়, নাম ডোভার পাহাড়। উপকূল থেকে মাইল বিশেক দূরে। পানি থেকে খাড়া আকাশের দিকে উঠে

গেছে পাশাপাশি দুই পাহাড়। একটার চূড়া অন্যটার তুলনায় বেশ খানিকটা লম্বা।

সেটার নাম বড় ডোভার, অন্যটার নাম ছোট ডোভার। এই দুই পাহাড়কে ঘিরে রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টাই প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসের মাতামাতি চলে, তার সাথে তাল মিলিয়ে সাগরও সারাক্ষণ উন্মত্ত আচরণ করে এখানে।

পানি আর বাতাসের ভয়াবহ ক্রুদ্ধ গর্জনে কান পাতা দায় ডোভারে। মনে হয় যেন একসাথে হাজারটা কামান থেকে অনবরত গোলা ছোঁড়া হচ্ছে।

সার্বক্ষণিক ঢেউয়ের আঘাতে পাহাড় দু'টোর গা ক্ষয়ে ক্ষয়ে সিঁড়ির মত খাঁজ কাটা ধাপের সৃষ্টি হয়েছে, ক্রমে চূড়ার দিকে উঠে গেছে ধাপগুলো। গোড়ার দিকে বড় বড় গুহাও আছে বেশ কয়েকটা।

গোটা ইংলিশ চ্যানেলে ডোভারের মত বিপজ্জনক জায়গা আর নেই। নাবিকেরা যমের মত ভয় করে ডোভারকে, ওই এলাকার ধারেকাছে ঘেঁষার কথা স্বপ্নেও ভাবে না তারা। একমাত্র সামুদ্রিক পাখি ছাড়া অন্য কোন প্রাণী দেখা যায় না ডোভারে।

এই দুই পাহাড়ের দুই চূড়াকে দূর থেকে দেখতে লাগে একজোড়া খাড়া গম্বুজের মত। দুই গম্বুজের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। চ্যানেল এমনিতেই সারাক্ষণ ভীষণ বিক্ষুব্ধ থাকে এদিকটায়, দুই ডোভারের মাঝখানে থাকে আরও অনেক অনেক বেশি।

দু'টোর মধ্যে দিয়ে সারাক্ষণ প্রচণ্ড ঘূর্ণি, জলোচ্ছ্বাস আর তীব্র স্রোত থাকে, সব মিলিয়ে সাঙ্ঘাতিক আবহাওয়া

ডোভারের। আর স্রোত? সে এক অবিশ্বস্য ব্যাপার–দিশেহারার মত ভয়ঙ্কর গতিতে এদিক-সেদিক ছোটে।

নাবিকেরা জানে ওই ঘূর্ণি আর স্রোতের মধ্যে একবার পড়লে আর রেহাই নেই, পানির আঘাতে ডোভারে আছড়ে পড়ে ছাতু হয়ে যাবে জাহাজ। তাই অনেক পথ ঘুরে ওই এলাকাকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে চলাচল করে তারা। ডোভার পাহাড়ের কাছে আরেকটা পাহাড় আছে, সেটার নাম স্কেলিটন।

শোনা যায়, অনেক বছর আগে এই পাহাড়ের কাছে কোথাও একটা জাহাজডুবী হয়েছিল। সেটার এক নাবিক ভাগ্যক্রমে ভাসতে ভাসতে এই পাহাড়ে এসে ওঠে। কাঁকড়া ইত্যাদি খেয়ে সপ্তাখানেক বেঁচে ছিল হতভাগ্য লোকটা। তারপর যা ঘটার তাই ঘটল।

এর অনেকদিন পর এক দুঃসাহসী জেলে এদিকে মাছ ধরতে এসে দূর থেকে পাহাড়টার ওপর একটা কঙ্কাল দেখতে পায়। সেই থেকে ওটার নাম স্কেলিটন। সেটাকে ঘিরেও পানি আর বাতাস একই আচরণ করে।

***

শুক্রবার সকাল ন'টায় সাতজন নাবিক ও দু'জন যাত্রী নিয়ে সেইন্ট ম্যালো বন্দর ত্যাগ করল দুরান্দ। খোলা সাগরে পৌঁছে তাঙরুল নামের এক পুরানো, অভিজ্ঞ নাবিকের ওপর জাহাজের হাল ধরার দায়িত্ব দিল ক্রুবিন। নাবিক হিসেবে খুব দক্ষ ছিল লোকটা, কিন্তু মস্ত একটা দোষও ছিল তার।

প্রায় সময়ই মদ খেয়ে বেহেড মাতাল থাকত। তাছাড়া মদ নিয়ে বসলে একেবারে গলা পর্যন্ত না গিলে উঠত না লোকটা। এটা তার বহুদিনের অভ্যাস।

রাতের প্রথমভাগে প্রায়ই ডিউটি অফ থাকত তাঙরুলের। ওই সময়টা ঘুমিয়ে কাটাত সে, তারপর মাঝরাতে উঠে মদের বোতল নিয়ে বসত। এটা ছিল তার নিয়মিত রুটিন। ব্যাপারটা ক্লুবিনের জানা ছিল।

এ-ও ভালই জানত যে সকালের দিকে নেশা বেশ তুঙ্গেই থাকে তাঙরুলের, তবু তার ওপরেই প্রথমদিন দুরান্দের হাল ধরার দায়িত্ব দিল সে। নেশাখোরদের প্রত্যেকেরই নেশা করার নির্দিষ্ট গোপন একটা জায়গা থাকে।

তাঙরুলেরও এরকম একটা জায়গা আছে দুরান্দে। ক্লুবিনের সে খবর জানা ছিল। এবং এই জ্ঞানটাও ভালমতই কাজে লাগিয়েছিল সে।

জাহাজ যাত্রার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত আছে কিনা, ব্যাপারটা চেক করে দেখতে আগেরদিন অনেক রাতে দুরান্দে এসেছিল ক্লুবিন। তাঙরুল সে সময় নিজের কেবিনে প্রবল বেগে নাক ডাকাচ্ছে। পরে ঘুম ভাঙতে পান করার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে এল সে।

ঘুম ঘুম চোখে সেখানে বড় একটা বোতল দেখে অবাক হলো লোকটা। ব্র্যান্ডি! লেবেল দেখলেই বোঝা যায় ভাল কোম্পানির তৈরি দামী জিনিস। আশ্চর্য, এই জিনিস কি ভাবে এল এখানে? কে আনল? সে তো কখনও ব্র্যান্ডি খায় না!

তার এখানে বাইরের কেউ আসেও না, তাহলে কে আনল এটা? ভাবনা-চিন্তার পিছনে সময় নষ্ট না করে বোতলটার ছিপি খুলে ফেলল সে। ভাল জিনিস গেলার এমন একটা সুযোগ যখন পাওয়াই গেল, সেটা ছাড়া চরম বোকামী হবে। বোতলের আসল মালিক যে কোন সময় হুট্ করে এসে পড়তে পারে, এই

ভয়ে ঢক্ ঢক্ করে গিলতে শুরু করে দিল সে। বলতে গেলে এক চুমুকেই সবটা সাবাড় করে নিশ্চিন্ত হলো, বোতল সাগরে ফেলে দিল।

পরদিন ক্রুবিনের নির্দেশে যখন হাল ধরল, তখন বলতে গেলে পুরোপুরি মাতাল তাঙরুল। মাথা ঘুরছে তার, পা টলছে, দু'-তিনটা করে দেখছে সবকিছু।

আকাশ একদম পরিষ্কার সেদিন। ঝলমল করছে। এক ফোঁটা মেঘও চোখে পড়ছে না কোথাও। পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে চললেও কিছুক্ষণ পরই জাহাজের আরোহী ও নাবিকদের কারও কারও মনে সন্দেহ দেখা দিল, দুরান্দ সঠিক কোর্সে চলছে না মনে হলো তাদের।

তবে ক্যাপ্টেন ক্রুবিনের ওপর সবার অগাধ আস্থা আছে, তারা জানে সে থাকতে চিন্তার কিছুই নেই। তাই ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না কেউ। কিন্তু আরও বেশ কিছু সময় পর অনেকেরই আস্থায় চিড় ধরতে শুরু করল।

সেই পুরনো সন্দেহ ফিরে এল তাদের মধ্যে। কারও কারও মনে হলো পথ ভুল করেছে দুরান্দ। গেরানসির দিকে নয়, জারসি দ্বীপের দিকে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কানে যেতে প্রথমে হেসেই উড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেন। তার ধারণা, এতবড় ভুল তাঙরুলকে দিয়ে হতেই পারে না। কিন্তু নাবিকরা তো নয়ই, যাত্রীরাও তার ধারণার সাথে একমত হতে পারছে না দেখে একসময় ঘটনা তদন্ত করতে এল সে। দেখল সত্যিই তো! ভুল পথেই তো চলেছে দুরান্দ! তাঙরুলকে খানিক বকাঝকা করে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ওটাকে গেরানসির

সঠিক কোর্সে নিয়ে এল সে। এর ফলে বেশ কিছু সময় অনর্থক নষ্ট হলো। ওদিকে হুইল হাউসে তাণ্ডবলের নেশা কমার কোন লক্ষণ নেই।

বরং তখনও একটু একটু করে চড়ছে। পা রীতিমত টলছে তার, হাতেও মনে হলো শক্তি পাচ্ছে না সে ঠিকমত। তবে এ নিয়ে তখনই আর কোন কথা উঠল না। একটু পর পর ক্যাপ্টেন নিজে এসে খোঁজখবর নিচ্ছে, কাজেই চিন্তা কিসের?

দুপুরে খাবারের ঘণ্টা বাজতে সবাই খেয়ে নিল, খেল না কেবল ক্লুবিন। ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে তাকে, চোখেমুখে অস্বাভাবিক একটা ভাব। যেন কিছু একটা ঘটার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে মানুষটা।

খেয়েদেয়ে গল্প করছে জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা, এমন সময় হুইল হাউস থেকে ক্যাপ্টেনের চিৎকার ভেসে এল, 'বেরিয়ে যাও, মাতাল কোথাকার!'

কৌতূহলী হয়ে পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সবাই। দেখতে পেল ভেতরে তাণ্ডবলের সামনে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন, রাগে তার দু'চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসার জোগাড়।

ওদিকে নেশাগ্রস্ত হলেও নিজের অপরাধ সম্পর্কে তাণ্ডবলকে ভালই সচেতন মনে হলো তাদের। ধমক খেয়ে ক্লুবিনের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ব্যাপার বুঝতে না পেরে সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তখনই আচমকা অন্য এক ঘটনা ঘটল। দেখতে দেখতে ঘন কুয়াশায় ছেয়ে গেল আকাশ, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কুয়াশার বিশাল এক মেঘ দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল দুরান্দের দিকে।

তাই দেখে ভয় পেয়ে গেল অনেকেই। কিন্তু কুবিনকে মোটেও বিচলিত হতে দেখা গেল না। নাবিকদের নির্দেশ দিল সে, 'এনজিনে বেশি করে কয়লা ভরে স্টীম বাড়িয়ে দাও!'

বেশ কিছুক্ষণ কুয়াশার মেঘটার ধার ঘেঁষে চলল দুরান্দ, তারপরই চরদিক থেকে খুব দ্রুত এগিয়ে এল মেঘ, দুরান্দকে ঘিরে ধরল চারদিক থেকে। সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল। একটা অদ্ভুত কালো চাদর যেন মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বচরাচর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিল ওটাকে।

কোনদিকেই কিছু দেখার উপায় রইল না। ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠল প্রত্যেকের। প্রথম ধাক্কা সামলে উঠতে না উঠতেই এল দ্বিতীয় ধাক্কা, হঠাৎ শীত শীত অনুভূতি হলো সবার। ব্যাপার ঠিকমত বুঝে ওঠার আগে শীতে কাঁপুনিই উঠে গেল।

অসহ্য ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে গরম কাপড়ের খোঁজে যে যার আশ্রয়ের দিকে ছুটল মানুষগুলো। খানিক পর চারদিকের পরিবেশে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল হঠাৎ করে। সাগরের সমস্ত আলোড়ন যেন অদৃশ্য কোন হাতের ইশারায় থমকে গেছে। এনজিনের ধুক্ ধুক্ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ঘন কালো বিশাল মেঘের পাহাড়টার মধ্যে দিয়ে অজ্ঞাত ভয়ে অন্ধের মত পড়িমরি করে ছুটে চলেছে দুরান্দ। ভোঁশ ভোঁশ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে চোঙ থেকে। অকল্পনীয়, ভৌতিক একটা দৃশ্য।

'স্টীম খুব বেশি খরচ হচ্ছে, ক্যাপ্টেন,' নাবিকদের একজন সাহস করে বলল। 'তারওপর এত কুয়াশা, আমার মনে হয় এ সময় আর এগোনো ঠিক হবে না। কোথাও নোঙর ফেলে অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল হতো।'

'তার উপায় নেই,' ক্লুবিন জবাব দিল। 'এই মাতালটার জন্যে যে সময় নষ্ট হয়েছে তা পূরণ করতে হবে না?'

আগের মত পূর্ণ গতিতেই ছুটতে থাকল দুরান্দ। ওদিকে কুয়াশায় পথ দেখা যায় না বলে গেরানসির একটা জেলে নৌকা মাঝসাগরে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছিল, একটু পর খুব কাছ দিয়ে ওটাকে পাশ কাটাল দুরান্দ। জেলে লোকটার সন্দেহ হলো জাহাজটার গতিপথ লক্ষ করে।

একটু যেন বেশি পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে না ওটা? চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল জেলে। পশ্চিমদিকে যাচ্ছে না? তাই তো! সঠিক কোর্সে চলছে না দুরান্দ।

তাছাড়া এই ঘন কুয়াশার মধ্যে ওটার এরকম পড়িমরি করে ছোটাও খুব অদ্ভুত মনে হলো জেলের। এভাবে অন্ধের মত এগোতে থাকলে যে কোন মুহূর্তে জাহাজ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়তে পারে, এই সাধারন জ্ঞানটাও ক্যাপ্টেনের নেই নাকি? ভাবছে লোকটা।

বেলা দু'টোর পর আরও খারাপের দিকে মোড় নিল আবহাওয়া। কুয়াশা এত ঘন হয়ে উঠল যে কয়েক হাত দূরের জিনিসও ভাল করে দেখা যায় না।

সাগর আকাশ সম্পূর্ণ মুছে গেছে চোখের সামনে থেকে। বাতাসেরও নাম-গন্ধ নেই। বৃষ্টি নেই, অথচ তারপরও সবার কাপড়চোপড় ভিজে উঠেছে। এ কেমন আবহাওয়া?

নাবিকদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল সংক্রামক অসুখের মত। মুখে না বললেও চেহারা দেখে তাদের মনের অবস্থা বুঝতে অসুবিধে হয় না—প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সবাই। ওদিকে ক্যাপ্টেন ক্লুবিন অনেক আগেই তাণ্ডরুলকে

সরিয়ে দিয়ে নিজে হাল ধরেছে জাহাজের। রাগ পড়েনি তার, এখনও থেকে থেকে লোকটাকে গালাগাল করে চলেছে।

'শয়তান কোথাকার! আমাদের সাথে চালাকি করেছ তুমি! আগে থেকেই আমাদের এই বিপদে ফেলার বুদ্ধি করে রেখেছিলে, কেমন? তোমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা উচিত, বদমাশ কোথাকার! যাও, দূর হয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে!'

জবাব দেয়া দূরে থাক, মাথাই তুলছে না লোকটা। অপরাধীর মত নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনটার সময় নিচের দিকের কুয়াশা অনেকটা হালকা হয়ে আসতে দীর্ঘ সময় পর সাগরের দেখা পাওয়া গেল। চারদিকে নীল পানির বিস্তার চোখে পড়তে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল যাত্রী-নাবিক সবাই।

এক হাতে হাল ধরা অবস্থায় অন্য হাতে দূরবীন তুলে নিল ক্লুবিন, সামনে তাকিয়ে আপনমনে বলল, 'মাতালটা দেখছি অনেক দূরে এনে ফেলেছে আমাদের। এখন আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা চলবে না।'

ওদিকে গেরানসির দুই যাত্রীর একজন জাহাজের একদম মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। নিজের দূরবীন চেখে লাগিয়ে সামনে তাকিয়ে জায়গাটা চেনার চেষ্টা করছিল সে। অনেকক্ষণ পর দূরে, হালকা কুয়াশার মধ্যে হঠাৎ সামান্য আলো ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল দেখে ভয় পেল লোকটা।

এক ছুটে হুইল হাউসে এসে দাঁড়াল সে, ভীত গলায় হড়বড় করে বলল, 'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!!'

'কি ব্যাপার?'

'আমরা মনে হয় ভুল করে হ্যানওয়ের কাছে এসে পড়েছি।'

'দূর!' হেসে উঠল ক্যাপ্টেন। 'তা হয় কি করে!'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন,' লোকটা জোর দিয়ে বলল। 'ওটা হ্যানওয়ে পাহাড়ই।'

'অসম্ভব! রেগে উঠল ক্রুবিন। 'নিশ্চই ভুল দেখেছেন আপনি। এখন যান এখান থেকে।'

কিন্তু সে অনড়। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'মোটেই ভুল দেখিনি আমি, ক্যাপ্টেন। হ্যানওয়ের চূড়া একদম স্পষ্ট দেখেছি আমি। ভুল হতেই পারে না।'

'কই, কোথায় আপনার হ্যানওয়ে?' বলল সে। কি এক আনন্দে চোখমুখ মুহূর্তের জন্যে ঝলমল করে উঠল।

সরল মানুষ যাত্রীটি খেয়াল করল না ব্যাপারটা। হাত তুলে জায়গাটা দেখিয়ে দিল ক্যাপ্টেনকে। 'ওই যে!'

'দূর!' বিরক্ত হওয়ার ভান করে সেদিকেই দুরান্দের গলুই ঘুরিয়ে দিল ক্রুবিন। 'কি আবোল-তাবোল বলছেন! কোথায় হ্যানওয়ে পাহাড়? আমি তো ওদিকে খোলা সাগর ছাড়া আর কিছুই দেখছি না!'

লোকটা কয়েক মুহূর্ত বোকার মত ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর তাড়াতাড়ি হুইল হাউস থেকে বেরিয়ে এসে দূরবীনের কাঁচ পরিষ্কার করে আবার সামনে তাকাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। ভয়ে দু'চোখ বিস্ফারিত। 'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন ---'

'আবার কি হলো?'

'বাঁচতে চাইলে এখনই জাহাজের গলুই ঘুরিয়ে দিন!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল সে। 'না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কেন?' নকল বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করল ক্রুবিন।

'আমার দেখায় ভুল হয়নি। ওটা হ্যানওয়ে পাহাড়ের চূড়া।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'হতেই পারে না আপনি আসলে ঘন কুয়াশার স্তূপ দেখেছেন।'

আতঙ্কে কাঁপতে লাগল লোকটা। জড়ানো গলায় হড়বড় করে বলল, 'যিশুর কসম করে বলছি, ক্যাপ্টেন, ওটা হ্যানওয়ে পাহাড়! এখনও সময় আছে, বাঁচতে চাইলে তাড়াতাড়ি জাহাজ ঘোরান, নইলে আমাদের সবাইকে আজ ধনেপ্রাণে মরতে হবে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যান। আমি দেখছি! এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

কথা শেষ করে যেন লোকটাকে আশ্বস্ত করার জন্যেই হাল একদিকে সামান্য ঘুরিয়ে দিল ক্রুবিন, এর পরপরই কিছু একটার সাথে ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটল দুরান্দের, বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল।

সামনের দিক থেকে ওঠা কাঠ ভাঙাচোরার বিকট কড়কড় মড়মড় শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে ঝাঁকির পর ঝাঁকি আর হোঁচট খেতে খেতে অনেক কষ্টে একটু একটু করে খানিকটা এগোল ওটা। তারপর গতি পুরোপুরি হারিয়ে একেবারে থেমেই পড়ল শেষ পর্যন্ত। ওদিকে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই প্রথম ধাক্কার চোটেই ছিটকে চলে গেছে এদিক-সেদিক।

অনেকক্ষণ পর জাহাজ মোটামুটি স্থির হলো। সাথে সাথে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল সেই যাত্রীটি। দূরবীন ডেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

'হায়, হায়! আমি ঠিকই বলেছিলাম! ঠিকই বলেছিলাম আমি! জাহাজ হ্যানওয়ের ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে! শেষ হয়ে গেলাম আমরা! হায়, হায়! এখন কি হবে আমাদের?'

তার দেখাদেখি অন্যরাও চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু ধমক মেরে সবাইকে থামিয়ে দিল ক্লুবিন। 'চুপ করুন! সবাই চুপ করুন! এত ভয় পাওয়ার মত কিছু ঘটেনি। কেউ শেষ হয়ে যায়নি এখনও।'

ডেকে কারও ছুটে আসার ভারী ধুপ্‌ধাপ্ পায়ের শব্দ উঠতে ঘুরে তাকাল সবাই। দেখা গেল প্রায় নগ্ন এক নিগ্রো নাবিক এনজিন রুমের দিক থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছে। এমনিতেই মানুষটা কালো, সেই সঙ্গে এনজিনরুমের কালিঝুলি মেখে কিম্ভূত চেহারা হয়েছে।

লোকটা দুরান্দের এনজিনম্যান। ক্লুবিনের সামনে এসে বেদম হাঁপাতে লাগল সে। 'ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন! সর্বনাশ হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন!'

'কি হয়েছে? ধমক মেরে উঠল ক্লুবিন।

'জাহাজের তলা জাহাজের তলা ফেটে গেছে, ক্যাপ্টেন! অনেকখানি। এনজিনরুমে স্রোতের মত পানি ঢুকছে। আগুন নিভে যাবে যে কোন মুহূর্তে।'

কারও বুঝতে বাকি রইল না দুরান্দের ভাগ্যে কি ঘটেছে– ডুবো পাহাড়ের চূড়ায় বেকায়দারকম ধাক্কা খেয়ে তলা ফেটে গেছে ওটার। সেই ফাটল দিয়ে হুড়মুড় করে পানি ঢুকছে ভেতরে।

এদিকে চারদিক আঁধার করে রাতও ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে, তারওপর ঘন কুয়াশা। কোনদিকে নজর চলে না। এই

অবস্থায় কপালে কি আছে, কাউকে তা বলে দেয়ার দরকার পড়ে না।

মাঝসাগরে ডুবন্ত জাহাজের ডেকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল সবাই। বোধবুদ্ধি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে।

ওদিকে জাহাজ ধাক্কা খেতে তাণ্ডরুলের নেশা কেটে গেছে। পরিস্থিতি বুঝে নিতে বেশি দেরি হলো না তার। সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাল সে ফ্যালফ্যাল করে, তারপর পায়ে পায়ে এনজিনরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

একটু পর উদ্বিগ্ন চেহারায় ফিরে এসে মিনমিনে গলায় বলল, 'খোলের ভেতরে খুব বেগে পানি ঢুকছে, ক্যাপ্টেন। মনে হয় দশ মিনিটের মধ্যে ডেকে উঠে আসবে।'

এ কথা শুনে নাবিক-যাত্রী প্রত্যেকে ভয়ে বেদিশা হয়ে উঠল, পাগলের মত অর্থহীন ছোটাছুটি শুরু করে দিল দুরান্দের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত। যখন হুঁশ ফিরছে; বুঝতে পারছে এভাবে পালিয়ে বাঁচা যাবে না, তখন কিছুক্ষণের জন্যে থেমে এদিক-ওদিক তাকায়।

তারপর আবার সেই চিৎকার-চেঁচামেচি, দৌড়-ঝাঁপ। অবস্থা বেগতিক বুঝে লোকগুলোকে আশ্বস্ত করার জন্যে এক জায়গায় জড়ো করল ক্লুবিন। সবাই এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াতে নিগ্রো লোকটাকে জিজ্ঞেস করল সে, 'এনজিন আর কতক্ষণ চালু রাখা যাবে?'

'বড়জোর পাঁচ-ছয় মিনিট, ক্যাপ্টেন' জবাব দিল লোকটা। 'তার বেশি না।'

গেরানসির সেই যাত্রীর দিকে ফিরল ক্লুবিন। লজ্জিত ভঙ্গিতে

বলল, 'আমি তো হাল ধরা অবস্থায় ছিলাম, ঠিকমত দেখতে পাইনি। আপনি পাহাড়টা দেখেছিলেন, না?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'একদম স্পষ্ট দেখেছি। সেই জন্যেই তো আপনাকে তখন বারবার সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু আপনি আমার কথায় কান দেননি। আমার কথা যদি শুনতেন ... !'

এ অভিযোগের কোন উত্তর দিল না ক্লুবিন। একটু সময় ভাবল, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'এখান থেকে উপকূল কতদূর হবে মনে হয়?'

'মাইলখানেকের মত।'

দুরান্দের খোলের ভেতরে ছিল এক পাল গরু-ছাগল, হঠাৎ করে সেগুলো ভীত সন্ত্রস্ত গলায় চেঁচামেচি শুরু করে দিতে ওপরেও ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। নিশ্চয়ই পানি ঢুকে পড়েছে ওগুলোর প্রকোষ্ঠে।

তাকে ঘিরে থাকা আতঙ্কিত মুখগুলোর দিকে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকাল ক্লুবিন। কিছুসময় ভাবল কি যেন। তারপর চড়া গলায় নির্দেশ দিল, 'তাড়াতাড়ি পানিতে নামাও লাইফবোট! আর দেরি করা যায় না।'

নির্দেশ পাওয়ামাত্র ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতিটা নাবিক-যাত্রী, হুড়োহুড়ি করে বোটটা নামানো হলো পানিতে। ঠিক তখনই থেমে গেল এনজিনের শব্দ, আগুন নিভে গেছে। অর্থাৎ আর বেশি দেরি নেই জাহাজ ডুবতে।

দ্বিতীয়বার নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে তাড়াতাড়ি লাইফবোটে নেমে গেল দুরান্দের সাধারণ দুই যাত্রী, তারপর নামল নাবিকেরা। এরমধ্যে নিজের কেবিন থেকে জাহাজের

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজপত্র ও কম্পাসসহ অন্যান্য দামী যন্ত্রপাতি একটা থলেতে বেঁধে নিয়ে এসেছে ক্লুবিন। থলেটা নিগ্রো মেশিনম্যানের হাতে তুলে দিল সে।

'এটা নিয়ে যাও সাথে করে। লেতিয়ারিকে দিয়ো। যাও, তাড়াতাড়ি বোট ছেড়ে দাও।'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে ভীষণ অবাক হলো সবাই, একযোগে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। 'কি বলছেন? আপনি আমাদের সাথে যাচ্ছেন না?'

মুখ খোলার আগে রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকাল ক্লুবিন, দেখল পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জাহাজের একদিকের খোল একেবারেই চুরমার হয়ে গেছে। তবে এখনই ডুববে না দুরান্দ, ডুবো চূড়ায় আটকে গেছে বলে সময় লাগবে।

আবহাওয়ার যে অবস্থা, তাতে ঝড় উঠবে যে কোন সময়ে, আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে সাগর, পাহাড় সমান একেকটা ঢেউ উঠতে শুরু করবে।

তখন কি ঘটবে জানা কথা। ঢেউয়ের আঘাতে অনবরত পাহাড়ে আছাড় খেতে খেতে গোটা জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

'না,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'আপনারা চলে যান।'

'সে কি! কেন?' কেউ একজন বলল।

'আমি কোথাও যাচ্ছি না। জাহাজেই থাকছি।'

সবাই ভাবল বোটে এতজন মানুষ ধরবে না বলেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্যাপ্টেন, তাই একযোগে চেঁচামেচি শুরু করে দিল তারা। সমস্বরে বলতে লাগল, 'না, না, ক্যাপ্টেন! তা কেন করতে যাবেন আপনি? চলে আসুন। বোটে আরেকজনের

জায়গা ঠিকই হয়ে যাবে।'

তাঙরুল বলল, 'আপনার কি দোষ, ক্যাপ্টেন? আপনি জাহাজে থেকে কেন আত্মাহুতি দিতে চাইছেন? দোষ যদি কারও হয়ে থাকে, হয়েছে আমার। সে জন্যে শাস্তি তো আমারই হওয়া উচিত! আমাকে যা খুশি শাস্তি দিন, তবু আপনি চলে যান।'

'না, তা হয় না, তাঙরুল' ক্লুবিন দৃঢ় কণ্ঠে বলল। 'এই অবস্থায় ক্যাপ্টেন হয়ে আমি নিজের জাহাজ ছেড়ে যাই কি করে? জাহাজের ভাগ্যে যা ঘটে, ক্যাপ্টেনের ভাগ্যেও তাই ঘটা উচিত। তাছাড়া দুরান্দের ক্যাপ্টেন তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেনি, এমন কথা বলার সুযোগ আমি কাউকে দেব না। তোমরা চলে যাও।'

তাঙরুলের দিকে তাকাল সে। সহজ, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'যাও তাঙরুল, মনে কোন দুঃখ রেখো না। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

একটু থেমে গলা চড়িয়ে বলল, 'আমি আদেশ করছি, নৌকা ছেড়ে দাও। তীরের দিকে যাত্রা করো এখনই। বিদায়, বন্ধুরা! বিদায়!'

ক্যাপ্টেনের নামে ঘন ঘন জয়ধ্বনি করতে লাগল আরোহীরা। 'ক্যাপ্টেন ক্লুবিন, দীর্ঘজীবী হোন!' অন্ধকার ইংলিশ চ্যানেলের বুক কেঁপে উঠল তাদের চিৎকারে।

বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় দোল খেতে খেতে জাহাজের গা থেকে সরে গেল লাইফবোট, ঘুরে উপকূল লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল ওটা কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্যে।

দুরান্দের ডেকে সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে আছে ক্লুবিন, সাগরের গভীর থেকে ফুলেফেঁপে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ঢেউয়ের ভয়াবহ রূপ দেখছে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। মনে হচ্ছে চারদিকে একটু পরপর হাজারটা কামান একযোগে হুঙ্কার ছাড়ছে যেন।

ভয়াবহ ক্রুদ্ধ গর্জনের সাথে অসীম দিগন্তের পাণে ছুটে চলেছে সাগর।

আট

হঠাৎ করে আরও ঘন হয়ে উঠল কুয়াশা, ক্লুবিনের চোখের সামনে কে যেন আচমকা একটা পুরু পর্দা ঝুলিয়ে দিল। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। পেলে কলজের পানি শুকিয়ে জমাট বেঁধে যেত তার।

পাহাড় 'সনাক্তকারী' যাত্রীর মত তারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দুরান্দ সত্যি সত্যি হ্যানওয়ের কোন ডুবো পাহাড়েই ধাক্কা খেয়েছে। হ্যানওয়ের সাথে খুব ভাল পরিচয় ছিল ক্লুবিনের। ওই

পাহাড় থেকে উপকূলের দূরত্ব মাত্র এক মাইল, জানে সে। এইটুকু পথ সাঁতরে পাড়ি দেয়া তার জন্যে কোন ব্যাপারই নয়। সব সময় কোমরে একটা চওড়া চামড়ার বেল্ট পরে থাকত ক্লুবিন, শার্টের নিচে ঢেকে রাখত। সেটার বাক্‌লে তার নাম খোদাই করা আছে।

টাকা-পয়সা রাখার কয়েকটা বিশেষ খোপও আছে তাতে, নিজের যাবতীয় সঞ্চয় সব সময় তার একটার মধ্যে রাখে সে। রাতাগের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁসহ তার লোহার মানিব্যাগটাও আছে ওটার অন্য এক খোপে।

সেইন্ট ম্যালোর নির্জন সৈকতে যেদিন জুয়েলা-রাতাগকে শলা পরামর্শ করতে দেখল ক্রুবিন, সেদিনের সেই মুহূর্তেই আজকের এই অদ্ভুত জাহাজডুবী নাটকের পরিকল্পনা তার মনের মধ্যে গেড়ে বসে।

মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দেয় সে। শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছে, একটা নয়, এক ঢিলে চার-চারটা পাখি মেরেছে ক্রুবিন।

এক, কায়দা করে একদম উপযুক্ত জায়গায় জাহাজডুবী ঘটিয়েছে, দুই, 'আত্মাহুতি' দিয়ে নিজের ক্যাপ্টেনের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে, তিন, সবার অলক্ষে দুরান্দ থেকে কেটে পড়া এখন কিছু সময়ের ব্যাপার মাত্র, এবং চার, রাতাগের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁর সদগতি—সেটাও হতে কোন বাধা নেই এখন।

কিছুক্ষণ পর জোয়ার হলো সাগরে। পানির সাথে বাতাসের তেজও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড়ও শুরু হয়ে গেল। বাতাস আর পানির চাপে ঘন ঘন আড়মোড়া ভাঙতে শুরু কবল দুরান্দ। সেই সাথে গোঙাচ্ছে অনবরত।

কিছু সময় এভাবেই চলল, তারপর আগের অবস্থান ছেড়ে একটু একটু করে সরে এল ওটা। খানিকটা দূরের অন্য দুই পাহাড় চূড়ার মধ্যে নতুন করে আটকালো। বেশ ভালভাবেই আটকেছে এবার। তাই দেখে খুশি হলো ক্রুবিন। এখন আর

সহজে ডুবছে না জাহাজ, কাজেই তারও তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। নৌকাটা আরও দূরে সরে যাক।

তারপর ধীরেসুস্থে আর যাবেই বা কতদূর ওটা? ভাবল ক্রুবিন। যে ভীষণ ঝড় শুরু হয়েছে, তাতে ওইটুকু নৌকার ডুবে যেতে বেশি সময় লাগবে না। তাই যাক, তারপর নিশ্চিন্তে যাত্রা করতে পারবে তাহলে ক্রুবিন। এই সামান্য পথ পাড়ি দিতে কতক্ষণই বা লাগবে তার! বড়জোর এক ঘণ্টা!

ঠিক করা আছে, প্রথমে সাঁতরে তীরে গিয়ে প্লাইমো গ্রামে উঠবে সে, সেই পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নেবে। তাতে কোন সমস্যা হবে না। কারণ একে ঝড়ো আবহাওয়া, তারওপর সেখানে পৌছতে পৌছতে রাত গভীর হয়ে যাবে, অন্ধকারে কারও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

প্লাইমোয় পৌছে শুকনো কাপড়চোপড় পরে কিছু খেয়ে নেবে সে, তারপর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসবে। তবে প্রয়োজনের বেশি এক মুহূর্তও প্লাইমোতে থাকার ইচ্ছে নেই ক্রুবিনের। কারণ ওই পোড়োবাড়িটা হলো চোরাচালানীদের আড্ডাখানা। তাদের মধ্যে পরিচিত কেউ ওখানে থাকলে সমস্যা, ক্রুবিনকে চিনে ফেলতে পারে।

তাহলে তার এত যত্নের প্ল্যান মাঠে মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বরবাদ হয়ে যেতে পারে সব। কিন্তু ক্রুবিন তা কিছুতেই হতে দিতে পারে না।

কয়েকদিনের মধ্যে একদল স্প্যানিশ নাবিক জাহাজে করে চোরাই মালপত্র নিয়ে প্লাইমোয় আসবে বলে খবর পেয়েছে সে। এদিকের কাজ সেরে দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়ার কথা তাদের। টাকা পেলে তাকেও নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।

একবার যেতে পারলে হয়, তারপর আর কে পায় তাকে? নতুন একটা নাম, নতুন একটা পরিচয় নিয়ে নতুন কোন দেশে আবার জীবন শুরু করবে ক্লুবিন। টাকা তো আছেই সাথে, আর চিন্তা কি? ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠল সে। মনটা আনন্দে নাচছে তার থেকে থেকে।

ভাগ্যের চাকা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে যাবে, ক'দিন আগেও কি কল্পনা করতে পেরেছিল ক্লুবিন?

স্বপ্নের ঘোর ভাঙতে সচকিত হলো সে। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, নৌকাটা নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে এরমধ্যে। অথবা কে জানে, ডুবেই গেছে হয়তো!

এদিকে আঁধারও হয়ে এসেছে, আর দেরি করা যায় না। সাগরের যে অবস্থা, তীরে পৌছতে পৌছতে রাত অনেক হয়ে যাবে হয়তো।

কোমরের বেল্টটা আরেকটু কষে বেঁধে নিয়ে পানিতে নামার জন্যে প্রস্তুত হলো ক্লুবিন। তখনই জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হলো তাকে।

হঠাৎ করে সামনের কুয়াশার পর্দার মাঝে বড় একটা ফাঁক সৃষ্টি হলো। চারদিকের অনেকদূর পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল চোখের সামনে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সামনে তাকাল ক্লুবিন। পরক্ষণে চোখের সামনে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখে ভীষণ এক ঝাঁকি খেল।

এ কি! এ কোথায় এসে পড়েছে সে? কোথায় হ্যানওয়ে পাহাড়, এ যে ডোভার পাহাড়! তাইতো! ওই তো সামনেই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নাবিককূলের ত্রাস, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সেই স্কেলিটন! এত কঠিন এক বিস্ময় হজম

করতে অনেক সময় লেগে গেল ক্লুবিনের, বারবার আপাদমস্তক শিউরে উঠতে লাগল। ভয়ে, আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে তার।

সর্বনাশ! এমন কাণ্ড কি করে ঘটল? কি হবে এখন?

হ্যানওয়েতেই দুরান্দকে ডুবিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল ক্লুবিন, কিন্তু বেলা দু'টোর পর থেকে চারদিক কুয়াশায় এমনভাবে ঢাকা পড়ে গেল যে জাহাজ কোনদিকে যাচ্ছে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেনি।

তাই বলে যে এমন একটা সর্বনাশা কাণ্ড ঘটে যাবে, কে ভেবেছিল? তার মত অভিজ্ঞ এক ক্যাপ্টেন থাকতে জাহাজ সঠিক কোর্স ছেড়ে জাহাজ এত দূরে সরে আসবে, এ কেমন কথা? এমনটা তো হওয়ার কথা নয়!

তারওপর যাত্রীটি যখন বারবার জোর দিয়ে বলতে লাগল হ্যানওয়ে পাহাড়ই দেখেছে সে, তখন মুখে যাই বলুক, মনে মনে ঠিকই বিশ্বাস করেছিল ক্লুবিন। কারণ হিসেবে তাই হওয়ারই তো কথা ছিল!

তাছাড়া ওই লোকের কথা সে এতটাই বিশ্বাস করেছিল যে সত্যতা ভালমত যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করেনি। হিসেবে যে ভুল হতে পারে, সে চিন্তাই মাথায় আসেনি।

হায় হায়! এখন কি হবে? ভুল শোধরাবার আর কোন উপায়ও তো নেই! বোকার মত বারবার বড় ডোভার ও ছোট ডোভারের দিকে তাকাতে লাগল সে, ভয়ে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে।

কোথায় গেরানসির উপকূল থেকে এক মাইল দূরের হ্যানওয়ে আর কোথায় বিশ মাইল দূরের বড় ডোভার আর ছোট ডোভার ! এরকম মারাত্মক এক ভুল কেমন করে ঘটল

তার মত অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেনকে দিয়ে? এভাবেই শেষ হয়ে যাবে তার এত যত্নে গড়া স্বপ্নসৌধ? তাহলে কি নিষ্ঠুর নিয়তি তার ভাগ্যে তীর থেকে বহুদূরের এই সর্বনাশা পাহাড়ে খিদে আর তেষ্টায় ধুঁকে ধুঁকে মরার কথাই লিখে রেখেছিল? ভাগ্যের এ কি নির্মম পরিহাস!

দুরান্দের লাইফবোটটা থাকলেও না হয় একটা আশা ছিল, এখন তো তাও নেই অন্যদেরকে প্রায় জোর করেই ওটা নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে ক্লুবিন।

এক মাইল দূরে তীর, সেই আশায় বোট বেয়ে চলেছে লোকগুলো—খাবার পানি কিছুই নেই সঙ্গে। এক সময় আসল ব্যাপার যখন ধরতে পারবে লোকগুলো, তখন কি হবে কে জানে! নিশ্চয়ই চরম হতাশায় ভেঙে পড়বে মানুষগুলো।

খিদে তেষ্টা ঝড় আর অসহনীয় শীত, এতগুলো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা জয় করে বিশ মাইল উন্মত্ত সাগর ওই খুদে বোটে পাড়ি দেয়া কোনদিনও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না, সে ব্যাপারে ক্লুবিন প্রায় নিশ্চিত।

আর যদি ওরা গেরানসিতে পৌঁছতে না-ই পারে, তাহলে দুরান্দের ক্যাপ্টেনের এখানে আটকে পড়ার খবরও বাইরের পৃথিবীর কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। অর্থাৎ কেউ আসবে না তার খোঁজে।

তাহলে কি উপায় হবে ক্লুবিনের? বাইরের সাহায্য ছাড়া কি ভাবে লোকালয়ে ফিরবে সে? এখানকার চরম বিরূপ আবহাওয়ায় একজন মানুষের পক্ষে কতদিন টিকে থাকা সম্ভব?

এদিক-ওদিক তাকাল সে আশা নিয়ে। যতদূর দেখা যায় অসীম পানি আর পানি ছাড়া কিছুই নেই কোথাও। এখানে

কোনরকম সাহায্যের আশা করা বৃথা বুঝতে পেরে ধপ্ করে দুরান্দের দোদুল্যমান ডেকের ওপর বসে পড়ল সে।

একটু পর বাতাসের বেগ আরও কিছুটা বাড়তে কুয়াশার পর্দা পুরোপুরি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, একেবারে দিগন্তরেখা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেল ক্লুবিন। সাথে সাথে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল নতুন এক সম্ভাবনার কথা ভেবে।

সাগরে কুয়াশার সময় দুর্ঘটনা এড়াতে সব জাহাজই নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে, কুয়াশা কেটে গেলে আবার যাত্রা করে। কপাল ভাল থাকলে সেরকম একটা জুটে যেতেও পারে ভেবে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল ক্লুবিন, সামনে তাকিয়ে থাকল।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই ঘটল। বেশ কিছুক্ষণ পর অনেক দূরে, দিগন্তরেখার কাছে একটা জাহাজের মাস্তুল চোখে পড়তে আনন্দে মন নেচে উঠল তার। পুব থেকে পশ্চিমে, অর্থাৎ এদিকেই আসছে সেটা।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডোভারের কাছ দিয়ে যাবে। আনন্দে হেসে উঠল ক্লুবিন। মনে মনে বলল, এবারের মত বোধহয় বেঁচে গেলাম। পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। কি ভাবে জাহাজটার ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল।

দুই ডোভারের মাঝে আটকাপড়া আধা ডুবন্ত দুরান্দ এমনিতে ওটা কারও চোখে পড়বে না, সে ব্যাপারে ক্লুবিনের কোন সন্দেহ নেই। কাজেই যাতে পড়ে, সে জন্যে কিছু একটা করতে হবে। কি করা যায়?

নিজেকে প্রশ্ন করল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় ডোভারের চূড়াটাকেই সমস্যার একমাত্র সমাধান মনে হলো

তার। কোনমতে যদি ওখানে একবার উঠতে পারে সে, তাহলে বিপদ কেটে যাবে।

কাপড় উড়িয়ে দূরাগত জাহাজটার কারও না কারও দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করতে পারবে সে। চূড়াটার দিকে তাকিয়ে দুরান্দের সাথে ওটার দূরত্ব আন্দাজ করে নিল সে। মনে হলো দু'শো হাতের বেশি হবে না।

সাগর যদিও ভীষণ অশান্ত , কিন্তু ক্রুবিন ওসব পরোয়া করে না। যত ঢেউ আর স্রোতই থাকুক না কেন, সে ঠিকই জায়গামত পৌঁছে যেতে পারবে।

পানির ওপরে সাঁতার কাটতে সমস্যা হলে ডুব সাঁতার দিয়ে এগোবে। চিন্তা কি? ডুব সাঁতারেও ক্রুবিনের কোন জুড়ি নেই। মোট কথা এই সামান্য পথ পাড়ি দেয়া কোন ব্যাপারই নয় তার জন্যে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে, আর দেরি করা যায় না, এখনই পানিতে নামতে হবে। নইলে জায়গামত পৌঁছতে দেরি হয়ে যেতে পারে।

কাপড়চোপড় পরা অবস্থায় সাঁতার কাটতে অসুবিধে হবে বলে পরনে যা যা ছিল, সব খুলে ফেলল সে। ওসবের চিন্তা এখন না করলেও চলবে। একবার ওই জাহাজটায় উঠতে পারলে জামা-কাপড়ের অভাব হবে না।

কোমরের বেল্টটা আরও একটু কষে বেঁধে নিয়ে বড় ডোভারের দিকে তাকাল ক্রুবিন, শেষবারের মত আরেকবার ভাল করে ওটার দূরত্ব আর দিক নির্ণয় করে নিয়ে মাথা নিচু করে ডাইভ দিল। অনেক উঁচু থেকে একদম খাড়া ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ায় সাঁ করে বেশ অনেকখানি গভীরে চলে গেল

সে। ইচ্ছে আছে ওই এক ডুবেই বড় ডোভারের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছবে, তারপর পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে উঠে যাবে চূড়ায়। এবারের হিসেবে কোন ভুল ছিল না, এক ডুব সাঁতারে ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছল সে।

পানির ওপরে মাথা তুলতে গুহার মত বড় বড় কয়েকটা গর্ত দেখতে পেল—পরিচিত গর্ত। ভাটার সময় জেগে থাকে, এই পথে আসা-যাওয়ার সময় দূর থেকে বহুবার দেখেছে।

পানি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল ক্লুবিন, এমন সময় কাছের এক গুহা থেকে নরম, শুঁড়ের মত দীর্ঘ একটা হাত আচমকা বেরিয়ে এসেই তার কোমর পেঁচিয়ে ধরল।

ভীষণ ঠাণ্ডা একটা হাত!

পরমুহূর্তে হ্যাঁচকা টান পড়ল কোমরে, চোখের পলকে তাকে গুহার ভেতরে টেনে নিয়ে গেল ওটা। ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার বা আত্মরক্ষার জন্যে কিছু করার বিন্দুমাত্র সুযোগও পেল না যুবক, শেষ মুহূর্তে কেবল একটা চিৎকার করতে পেরেছিল কোনমতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্লুবিনের, কারও কানে গেল না তার আতঙ্কিত মরণ চিৎকার।

নয়

রেভারেন্ড কড্রেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে বন্দরে ফিরে এল গিলিয়াত। লোকটা নিজের পথে চলে যেতে সে-ও বাড়ির দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় দুঃসংবাদটা শুনতে পেল—লেতিয়ারির সাধের দুরান্দ সাগরে ডুবে গেছে।

একটু আগেই খবরটা পাওয়া গেছে—ঝড়ে বিধ্বস্ত দুরান্দ থেকে কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা নাবিক-যাত্রীদের মুখ থেকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল গিলিয়াতের। ঘটনা সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে লেতিয়ারির বাড়ির দিকে এগোল ও।

দূর থেকেই সেখানে অনেক মানুষের জটলা দেখতে পেল ও। রীতিমত ভিড় জমে গেছে বাড়িটার সামনে-ভেতরে। খবর শুনে বন্দরের চেনা-অচেনা অনেকেই এসেছে বৃদ্ধকে সহানুভূতি জানাতে, বিস্তারিত জানতে।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া জাহাজটির নাবিক-যাত্রীরাও আছে তার মধ্যে, তাঙরুল ছাড়া অবশ্য। পায়ে পায়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার জন্যে এগোল গিলিয়াত, ভিড় ঠেলে

ঢুকে পড়ল সামনের ঘরে। প্রচুর মানুষ সেখানে, পা রাখার জায়গা নেই।

প্রথমেই দেরুশেতের ওপর চোখ পড়ল ওর। ঘরের এক মাথায় চেয়ারে বসে আছে ও পাথরের মূর্তির মত, দু'গাল বেয়ে দরদর করে পানি ঝরছে। লেতিয়ারি রয়েছে ওর এক পাশে। দেয়ালে হেলান দিয়ে সামনের জটলার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে সে।

হ্যাট ভুরু পর্যন্ত নামানো। তলা দিয়ে দীর্ঘ, কাঁচাপাকা কিছু চুল বেরিয়ে আছে, বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে। তার হাত দু'টো নির্জীবের মত ঝুলছে দেহের দু'পাশে। দাঁড়াবার মধ্যে শিথিল, গা ছাড়া একটা ভাব। দেখে মনে হয় বোধবুদ্ধি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে মানুষটার।

তা পাওয়ারই কথা। দুরান্দ নেই, দুরান্দের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় আর কখনও সতৃষ্ণ নয়নে সাগরের দিকে তাকিয়ে দিন গুণতে হবে না, এত বড় রূঢ় এক বাস্তব কি করে মেনে নেয়া সম্ভব লেতিয়ারির পক্ষে? জীবনের বাকি দিনগুলো তাহলে কি নিয়ে কাটাবে সে?

এই বয়সে তার পক্ষে নতুন করে আর কিছু কি করা সম্ভব? রাতাগের বিশ্বাসঘাতকতার পর শেষ সম্বল যা ছিল, তাই দিয়ে দুরান্দ গড়েছিল লেতিয়ারি। ওটাই ছিল তার জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন। দুরান্দ না থাকার অর্থ হলো লেতিয়ারির আয় রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ এখন স্রেফ পথে বসতে হবে তাকে! এই ধরনের হাজারো চিন্তা হতবাক্, স্থবির করে তুলেছে লেতিয়ারিকে। স্তব্ধ হয়ে নাবিক ও যাত্রীদের মুখে নিজের প্রিয় দুরান্দের ধ্বংসের বর্ণনা শুনছে সে।

সেটা মোটামুটি এরকম ঃ আগের দিন দুপুরের পর ঘন কুয়াশায় দিক ভুল করে ডোভার পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে দুরান্দ। প্রচণ্ড ধাক্কায় দুরান্দের খোলের একদিক একেবারে চুরমার হয়ে গেছে।

প্রথমে অবশ্য ওটাকে হ্যানওয়ে ভেবেছিল সবাই। কারণ কুয়াশা এত ঘন ছিল যে কেউ ঠিকমত চিনে উঠতে পারেনি জায়গাটা। তাছাড়া ওটা যে ডোভার হতে পারে, সে কথা কেউ ভাবেইনি। ভাবার কোন কারণও ছিল না। কেননা সেইন্ট ম্যালো-স্যামসন রুট থেকে ডোভার অনেক দূরে!

কোর্স ছেড়ে অতদূর সরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না দুরান্দের। এই দুর্ঘটনার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী নাবিক তাঙরুল, ব্যাটা হদ্দ মাতাল অবস্থায় জাহাজ চালাচ্ছিল।

দুর্ঘটনার ব্যাপারে ক্যাপ্টেনের কোন দোষ ছিল না। সে বরং যথার্থ ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করে গেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। জাহাজ বাঁচানোর কোন উপায় দেখে নাবিক-যাত্রীদের সময় থাকতে লাইফবোট নিয়ে চলে আসতে বাধ্য করেছে।

ঝড়ের মধ্যে সাগরে চলার উপযুক্ত লাইফবোট একটাই ছিল দুরান্দে, উপায় নেই দেখে সেটায় করে চলে আসে তারা। বারবার অনুরোধ করার পরও ক্যাপ্টেন আসেনি তাদের সঙ্গে। প্রতিজ্ঞা করেছে, সে জাহাজেই থাকবে।

জাহাজ ছেড়ে আসার একটু পরই প্রবল ঝড়ে পড়ে লাইফবোট। বিশাল একেকটা ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে খাবি খেতে খেতে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল, জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিল সবাই, এমন সময় কাশমির নামে একটা জাহাজ এসে পড়ায় অল্পের জন্যে প্রাণে রক্ষা পায় লোকগুলো।

জাহাজটা তাদেরকে সেইন্ট পিটার বন্দরে পৌঁছে দিয়েছে। তাণ্ডরুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেখানে। লেতিয়ারির সামনের এক টেবিলে ক্লুবিনের পাঠিয়ে দেয়া দুরান্দের কম্পাস-জরুরি কাগজপত্র রয়েছে।

মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্তও লোকটা যে তার ওপর অর্পণ করা দায়িত্ব একান্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করে গেছে, ওগুলো তার সাক্ষী।

ক্লুবিন যে বিশ্বস্ত ও মহৎহৃদয় মানুষ, সব শোনার পর সে ব্যাপারে কারও মনে কোন সন্দেহ রইল না। তবে লোকটা যে মরেনি, এখনও বেঁচে আছে, সে ব্যাপারেও তাদরকে একমত হতে হলো। কেন, এবার আসছে সেই কাহিনী। ভিড়ের মধ্যে শিনটিন নামে এক জাহাজের ক্যাপ্টেনও ছিল, তার জানা আছে দুরান্দের সর্বশেষ পরিণতির খবর।

লোকটা তার কাহিনী বলতে শুরু করল, সেটা এরকম ঃ দুরান্দ যখন দুর্ঘটনায় পড়ে, শিনটিন নিয়ে তখন ওই এলাকার কাছাকাছিই ছিল সে। কুয়াশা পরিষ্কার হলে যাত্রা করবে বলে সাগরের মাঝে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করছিল।

অনেকক্ষণ পর ঝড়ের বেগ কিছুটা কমে আসতে কুয়াশাও হালকা হয়ে গেছে দেখে ফের যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল শিনটিন, এমনসময় হঠাৎ দূর থেকে গরু-বাছুরের ভয়ার্ত চেঁচামেচি শুনে চমকে ওঠে ক্যাপ্টেন।

যেদিক থেকে শব্দ আসছিল, নোঙর তুলে সেদিকে এগিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কিছুদূর যেতে দূর থেকে ডোভার পাহাড়ের এক ডুবো চূড়ায় দুরান্দকে আটকে থাকতে দেখতে পায় সে। বেহাল অবস্থা তখন সেটার।

উদ্ধারের কোন আশাই নেই। ওটা যেখানে, জাহাজ নিয়ে তার বেশি কাছে যাওয়ারও উপায় ছিল না। তাই কিছুটা দূরে নিজের জাহাজ থামিয়ে ওটায় মানুষজন আছে কি না বোঝার চেষ্টা করল ক্যাপ্টেন।

নানারকম শব্দ ও সঙ্কেতের মাধ্যমে দুরান্দের আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালিয়েছে সে অনেকক্ষণ ধরে। কোন লাভ হয়নি। সাড়া দেয়নি কেউ।

এক সময় ক্যাপ্টেনের সন্দেহ হলো, ওটায় বোধহয় মানুষজন নেই। গরু-বাছুরই আছে কেবল। তবু ভালমত নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সেখানেই রাত কাটায় শিনটিন। পরদিন, অর্থাৎ আজ ভোরবেলা আরেকবার দুরান্দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালানো হয় অনেকভাবে। কেউ সাড়া দেয়নি। নিশ্চিত হয়ে ফিরে আসার আয়োজন করছে সে, এমন সময় আবার ঝড় ছাড়ল।

সে কি ভীষণ ঝড়! বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় অল্প সময়ের মধ্যে ডুবো পাহাড় থেকে দুই ডোভারের মাঝখানে গিয়ে আটকে গেল দুরান্দ।

এখন সেখানেই ঝুলন্ত অবস্থায় আছে জাহাজটা খোল বরবাদ হয়ে গেলেও কাঠামোটা আরও কিছুদিন ভেসে থাকবে, খুব শীঘ্রিই ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। তবে নিত্য ঝড় আর পানির আঘাত সহ্য করে কতদিন ভেসে থাকতে পারবে, সে কথা বলা মুশকিল।

কাহিনীর শেষ পর্যায়ে এত হতাশার মধ্যেও একটা আশার বাণী শোনাল লোকটা। তা হলো, দুরান্দের কাঠামো অকেজো হয়ে গেলেও দামী এনজিনটার কোনরকম ক্ষতি হয়নি। ঠিকই

আছে ওটা। চেষ্টা করলে হয়তোবা ওটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হতেও পারে।

এই কথাটা যেন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করল লেতিয়ারির দেহে। নড়েচড়ে বসল সে। ভাবতে লাগল, শুধু ওই এনজিনটা নির্মাণের পিছনেই প্রায় চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ খরচ হয়েছিল এত টাকা দিয়ে ওরকম আরেকটা তৈরি করানো তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাছাড়া ফ্রান্সের যে এনজিনিয়ার ওটা তৈরি করেছিল, সে-ও আর বেঁচে নেই।

কাজেই ওই চিন্তা বাদ দিতে হবে। এখন একটাই উপায় আছে, কোনমতে ওটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা, যদি সম্ভব হয়। তাহলেও দুরান্দ হারানোর ক্ষতি কিছুটা পূরণ হয়। কিন্তু কে করবে কাজটা?

এমন অসম্ভব একটা কাজ করার মত বুকের পাটা কার আছে স্যামসনে? এতবড় দুঃসাহসী কে আছে যে ডোভারের মত গজব পড়া জায়গায় গিয়ে তার এই উপকারটা করে দেবে?

কে না জানে ডোভার কত ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জায়গা? এনজিন উদ্ধার করা তো পরের কথা, আগে তো ডোভারের ধারেকাছে পৌঁছতে হবে! এ অঞ্চলে এমন নাবিক কে আছে যে সেখানকার বিপদ সম্পর্কে জানে না?

একদিকে লেতিয়ারি এইসব ভাবছে, অন্যদিকে জিনিসটা উদ্ধারের নানান সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে উপস্থিত সবাই। কিন্তু শুধু সময় গড়াচ্ছে তাতে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

কেউ সফল হওয়ার মত কোন পথ কেউ দেখাতে পারছে না। যে ওটা উদ্ধার করে আনতে পারবে, তাকে প্রচুর নগদ

টাকা-পয়সা পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা করার পরও কেউ রাজি হচ্ছে না দেখে শিনটিনের ক্যাপ্টেন নিজেই এক সময় সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল।

'না, না, এ কাজ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল সে। 'ওটার আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল। ওই অঞ্চল আমি খুব ভাল করে চিনি। ওর ত্রিসীমানার কাছেই যেতে পারবে না কেউ, এনজিন উদ্ধার করা তো পরের কথা। নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি আছে জেনেও কেউ এমন অসম্ভব দায়িত্ব নেবে, আমার তা মনে হয় না। কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামানোর কোন অর্থ হয় না।'

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হতে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দেরুশেত। পটলচেরা দু'চোখের শান্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল জটলার মুখগুলোর ওপর। 'এমন কোন দুঃসাহসী পুরুষ কি আছে,' তেমনি শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'যে ডোভার থেকে দুরান্দের এনজিনটা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবে? তাহলে তাকেই বিয়ে করব আমি।'

সমস্ত আলোচনা, গুঞ্জন মুহূর্তে থেমে গেল। প্রত্যেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মেয়েটির মুখের দিকে। কারও মুখে কথা নেই, পলক পড়ছে না। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে যেন সবাই। নড়তে-চড়তেও ভুলে গেছে।

জটলার মধ্যে থেকে দেরুশেতের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল একজন। সে গিলিয়াত। 'দেরুশেত, সত্যি বলছ তাকেই বিয়ে করবে তুমি?'

দেরুশেত জবাব দেয়ার আগেই বুড়ো লেতিয়ারি ওর সামনে এসে দাঁড়াল। আশা-নিরাশার অদ্ভুত এক দোলায় দুলছে

মানুষটা। 'হ্যাঁ, গিলিয়াত,' প্রচণ্ড আবেগে গলা কেঁপে গেল তার। 'হ্যাঁ। আমি ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আমার দেরুশেত তাকেই বিয়ে করবে। আমার সবকিছুর মালিকও হবে সে।'

গিলিয়াত আর কিছু বলল না।

দশ

সর্বক্ষণের সঙ্গী ছোট সেই নৌকাটা নিয়ে একদিন সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর ডোভারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল গিলিয়াত, একা। আবহাওয়া ভাল ছিল না সেদিন। সাগরের চেহারা ঝোড়ো, মারমুখো। দেখলে যে কোন নাবিকের বুক কেঁপে উঠবে, কিন্তু ওর অতসব দেখার সময় নেই। ওর মধ্যেই নৌকা বেয়ে চলল একমনে।

মাথার মধ্যে কেবল একটাই চিন্তা, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে ডোভারে। যে করে হোক এনজিনটা উদ্ধার করে আনতে হবে। নইলে বেশি দিন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকলে অনবরত ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজের খোল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, সে ক্ষেত্রে এনজিনটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ডোভারের ভীষণ স্রোত।

ডোভারে পৌঁছার সোজা, কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক কোর্স ধরে চলল গিলিয়াত। সারারাত ঝড়ের সাথে একটানা যুদ্ধ করতে করতে এগোল। পুব আকাশে দিনের আলোর আভাস দেখা দেয়ামাত্র বাতাসের বেগ কমতে শুরু করল। কমতে কমতে একসময় থেমেই গেল।

রোদের সোনালী আলোয় হেসে উঠল ইংলিশ চ্যানেল। রাতভর বাতাসের টানা শোঁ শোঁ গান শুনে অভ্যস্ত হয়ে আসা যুবকের কানে হঠাৎ এই নীরবতা কেমন যেন লেগে উঠল। চারদিকে চোখ বোলাল ও। যতদূর দেখা যায় তীরের কোন চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ল না, যেন অন্য কোন পৃথিবী এটা।

চার দিগন্ত পর্যন্ত কেবল নীল পানি আর সাদা ফেনার কিরীট পরা অশান্ত ঢেউ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। সারাদিন একটানা নৌকা বেয়ে চলল গিলিয়াত, তারপর সারারাত।

দু' হাত অনবরত উঠছে আর নামছে, নামছে আর উঠছে। যন্ত্রচালিতের মত। নিজের কাজে এত মগ্ন, এতটাই একাগ্র, দেখে মনে হয় জীবনে এই একটা ব্রত নিয়েই বুঝি পৃথিবীতে এসেছে গিলিয়াত।

পরদিন দুপুরের দিকে ডোভারে পৌঁছল ও। সাগর বেশ শান্ত তখন। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। ভাটা চলছে, পানি সরে যাওয়ায় অনেকখানি জেগে উঠেছে ডোভার।

গোড়ার দিকের গর্তগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গিলিয়াত। জাহাজটা দুই ডোভারের মাঝের ফাঁকে আটকে আছে, তবে উপুড় হয়ে। এ অবস্থায় এনজিন উদ্ধার করা বেশ কঠিন হবে জেনেও আমল দিল না।

কাজটা যে সহজ হবে না, তা জেনে-বুঝেই তো এসেছে, তাহলে আর এ নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? তাছাড়া দু' চারদিনে শেষ হওয়ার নয় এ কাজ, তাও জানে।

তাই কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রশি ইত্যাদির সাথে জামা-কাপড়, বিস্কিট, পাউরুটি, বেসন দেয়া মাছ এবং বড় চামড়ার ব্যাগ ভরা খাবার পানিও নিয়ে এসেছে ও। অন্তত

দিন দশেক চলে যাবে এতে।

দুই ডোভারের চারদিকে প্রথমে একটা চক্কর দিয়ে নিল গিলিয়াত, একটা সুবিধেজনক জায়গা বেছে নিয়ে কোনমতে নোঙর করল নৌকাটাকে। তারপর সাথে করে বয়ে আনা মালপত্রগুলো রাখার উপযুক্ত জায়গার খোঁজে ডাঙায় উঠে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগল। খানিক পর ডোভারের চূড়ায় উঠতে শুরু করল ও।

ওখান থেকে চারদিকটা ভালমত দেখতে পাওয়া যাবে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা রেখে এমন অনায়াস ভঙ্গিতে উঠে যেতে শুরু করল যুবক, যেন এ পথ তার বহু চেনা। নিত্যই ওঠা-নামা করে। ওপরে উঠে দুরান্দের কাছে এসে দাঁড়াল গিলিয়াত, ভাল করে চোখ বোলাল ওটার ওপর।

একেবারে দুই চূড়ার মধ্যিখানে ফেঁসে গেছে জাহাজটা। দেখলেই বোঝা যায় ব্যাপারটা ভরা জোয়ারের সময় ঘটেছে, নইলে ওটার অত উঁচুতে ওঠার কোন কারণ নেই। কোনমতে জাহাজে উঠে খোলের মধ্যে ঢুকল ও।

দেখল ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে খোলটা। তবে আসল জিনিস ঠিকই আছে। একদম নতুনের মত ঝকঝক করছে এনজিনটা ওটাকে খোল থেকে মুক্ত করা খুব কঠিন হবে, জানে। কিন্তু সে চিন্তায় সময় নষ্ট করল না গিলিয়াত। সে যখনকার কাজ, তখন দেখা যাবে

এখন অন্য কাজ আছে। প্রথম কাজ হলো নৌকাটার জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করা, তারপর নিজের জন্যেও একটা আশ্রয় চাই। উপযুক্ত জায়গার খোঁজে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল যুবক।

তারপর নিচে এসে নৌকা নিয়ে আরেক চক্কর দিল ডোভারকে কেন্দ্র করে। স্কেলিটন চূড়ার নিচে, বড় ডোভারের কোলের কাছের খানিকটা জায়গা বেশ নিরাপদ মনে হলো গিলিয়াতের। নৌকাটা ওখানে রাখা যায়, ঝড় এলেও তেমন কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।

ওর সামান্য ওপরে, পাহাড়ের গা থেকে লম্বালম্বিভাবে বেরিয়ে আছে একটা দীর্ঘ, খাড়া পাথর। দানবীয় একটা হাত আকাশ নির্দেশ করছে যেন। হাতটা যেখান থেকে বেরিয়েছে, সেখানে একটা গুহামত আছে। ওটার মধ্যে একজন মানুষ কোনমতে রাত কাটাতে পারবে মনে হলো গিলিয়াতের। ওতেই চলবে, এর বেশি কিছু চায়ও না সে।

নৌকাটাকে জায়গামত এনে কষে বেঁধে রেখে সাথের পোঁটলাপাটলি নিয়ে পাথরের খাড়া হাত বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল গিলিয়াত। জায়গাটা দেখে সন্তুষ্ট হলো: যা ভেবেছিল ঠিক তাই, এখানে একজন মানুষের রাত কাটাতে কোন সমস্যাই হবে না।

বরং ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকেও বাঁচা যাবে। গুহায় নিজের সমস্ত মালপত্র গুছিয়ে রাখল ও। তারপর লম্বা একটা রশি নিয়ে সেটার একমাথা খাড়া পাথরটার সঙ্গে মজবুত করে বাঁধল, অন্য মাথাটা বাঁধল দুরান্দের সাথে, টান্‌টান্ করে।

প্রয়োজনের সময় লাইনটা ধরে ঝুলে ঝুলে স্কেলিটন থেকে জাহাজ, জাহাজ থেকে স্কেলিটনে ইচ্ছেমত আসা-যাওয়া করতে পারবে গিলিয়াত। নিচে নামতে হবে না সে জন্যে।

তবে এর একটা সমস্যাও আছে, মাঝপথে কোনমতে একবার হাত ফস্‌কে গেলেই সর্বনাশ। অনেক নিচের সাগরে

গিয়ে আছড়ে পড়তে হবে। কিন্তু সে চিন্তা করছে না গিলিয়াত। এ ধরণের চিন্তার পিছনে সময় নষ্ট করার মত মানুষ ও নয়। লাইনটা টেনেটুনে দেখে সন্তুষ্ট হলো যুবক।

তারপর নির্ভীকচিত্তে ডোভারের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঝড়ে দুরান্দ থেকে যে সমস্ত জিনিসপত্র উড়ে গিয়ে এখানে-সেখানে পড়ে ছিল, সব একটা একটা করে কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করতে লাগল।

পরদিন থেকে শুরু হলো তার আসল কাজ। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে কাজে লেগে পড়ল গিলিয়াত, অন্ধকার হয়ে না আসা পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম নিল না।

সারাক্ষণ একটাই চিন্তা তাড়িয়ে বেড়াল ওকে–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুরান্দের এনজিন উদ্ধার করে নৌকায় তুলতে হবে, দেশের পথে পাড়ি জমাতে হবে। দেরি করা চলবে না।

যেদিকেই চোখ যায়, কেবল পানি আর ঢেউ, ঢেউ আর পানি। কোথাও জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না। মাঝেমধ্যে এক-আধটা সামুদ্রিক পাখি দেখা যায়, এছাড়া অন্য কোন প্রাণীর সাড়া নেই, এমনই এক নির্জন দ্বীপে দিনের পর দিন, ভোর থেকে সন্ধের আঁধার না নামা অব্দি ভূতের মত খেটে চলল গিলিয়াত।

সময়মত খায় না, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয় না, সারাদিন কেবল কাজ কাজ আর কাজ। যখন ঘন আঁধার গ্রাস করে ফেলে বিশ্বচরাচর, রশি ধরে ঝুলে ঝুলে নিজের গুহায় ফিরে যায় গিলিয়াত।

ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহটা গ্র্যানিটের শীতল মেঝেতে এলিয়ে দেয়। তখন মনে হয়, ঘুমানোর সময় মা যেমন করে সারাদেহে তার

স্নেহের কোমল হাত বুলিয়ে দিত, সাগরও যেন তেমনি ভালবাসার পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

অন্ধকারে প্রায়ই দেরুশেভের মায়াবী মুখটা ওর মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, বিভোর হয়ে সেটার দিকে অপলক চেয়ে থাকে গিলিয়াত। ছবি মিলিয়ে গেলে হতাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, পাশ ফিরে শোয়।

এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুরো দশটা দিন কাটিয়ে দিল গিলিয়াত। অতিরিক্ত খাটুনি, অপর্যাপ্ত খাদ্য এবং ঘুমের অভাবে এরমধ্যে দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ওর, দাড়ি-গোঁফে মুখ ভরে উঠেছে। বনমানুষের মত হয়েছে চেহারা।

জামাকাপড় সব ছিঁড়ে-ফেটে একাকার, পায়ের জুতো জোড়া কোথায় গেছে তার হদিস নেই ওদিকে খাবার আর পানি, তাও ফুরিয়ে এসেছে অল্প কিছু বিস্কিট ছাড়া এখন তেমন কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

দেহের বল দিন দিন কমে আসছে ওর, ভয়ঙ্কর ডোভার একটু একটু করে শুষে নিচ্ছে জীবনী শক্তি। অথচ এখনও বোঝা যাচ্ছে না কতদিনে কাজটা শেষ হবে। খাবার-পানি ফুরিয়ে গেলে কি অবস্থা হবে জানে না গিলিয়াত, জানতে চায়ও না। ও শুধু জানে যতদিনে হোক, যে করে হোক, দুরান্দের এনজিন তাকে উদ্ধার করতে হবে।

ওটা না নিয়ে কিছুতেই ফিরে যাবে না সে।

এগারো

অবশেষে টানা পনেরো দিনের অমানুষিক সংগ্রাম আর কঠোর অধ্যবসায় সাফল্য নিয়ে এল একদিন। এপ্রিলের শেষ অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহ হবে তখন।

শেষ কাজটা শুধু বাকি এখন গিলিয়াতের। দুপুরের মধ্যে সেটাও সেরে ফেলল ও করাতের সাহায্যে দুরান্দের খোল কেটে চিমনিসহ অসম্ভব ভারী এনজিনটা আলাদা করে ফেলল। খোল থেকে মুক্তি পাওয়ামাত্র ওটার গড়িয়ে সাগরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই আগেই জাহাজের বড় বড় শেকল দিয়ে দুই চূড়ার সাথে ওটাকে খুব মজবুত করে বেঁধে নিয়েছিল গিলিয়াত। এমনভাবে বেঁধেছে, যাতে দুই চূড়ার মাঝখানে ঝুলে থাকে, তাতে বাকি কাজ সারতে অনেক সুবিধে হবে।

জোয়ারের সময় পানি যখন বাড়তে থাকবে, তখন নৌকাটাকে এনজিনটার একদম তলায় নিয়ে যাওয়া যাবে, বাঁধন খুলে ওটাকে তখন নৌকার পাটাতনে নামিয়ে আনা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

তাই করল গিলিয়াত, নৌকা ওটার তলায় নিয়ে এসে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকল। জোয়ার হতে সাগরের পানি

ফুলেফেঁপে উঠতে আরম্ভ করল, সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌকাটাও একটু একটু করে ওপরে জেগে উঠছে। একসময় এনজিনটার ঠিক তলায় এসে ঠেকল নৌকা, কাজ সেরে ফেলার এখনই উপযুক্ত সময়।

শেকল কাটতে উঠল গিলিয়াত, তখনই হঠাৎ করে ওর হাত-পা অসাড় হয়ে এল। রাজ্যের ক্লান্তি আর অবসাদ এসে ছেঁকে ধরায় চোখে রীতিমত আঁধার দেখল ও।

জীবনে দুঃসাহসী কাজ কম করেনি গিলিয়াত, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে অচিন সাগরের হাজারো বিপদ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কত অসাধ্যই না সাধন করেছে সে। এবারেরটা ছিল সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠিনতম।

যে ডোভারে একা একা যাওয়ার কথা মানুষের স্বপ্নেরও অতীত, যেখানকার পরিবেশের কথা ভেবে অতি বড় দুঃসাহসীও শিউরে ওঠে, সেই ভয়ঙ্কর ডোভারে একা একটানা দুই সপ্তাহ কাটিয়ে দিল সে।

যে অসম্ভব কাজ নিয়ে এসেছিল, অমানুষিক পরিশ্রম করে তাতে সফলও হয়েছে। কল্পনার অতীত এই সাফল্যের কথা ভেবে গিলিয়াত নিজেই যার পর নাই বিস্মিত। আনন্দে-উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

আর তখনই, সাফল্যের একেবারে দোড়গোড়ায় পা রাখামাত্র হঠাৎ কেন যেন আপাদমস্তক শিউরে উঠল, ধপ্ করে নৌকার পাটাতনের ওপর বসে পড়ল গিলিয়াত। ওর অবচেতন মনে কোন অশুভ আশঙ্কা উঁকি দিয়ে গিয়েছিল কি না কে জানে!

সারাদেহ থর থর করে কাঁপতে শুরু করল গিলিয়াতের। অবশ্য মনের সঙ্গে জোর খাটিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে

সহজ-স্বাভাবিক করে তুলল সে, লোহা কাটার করাত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকি কাজ শেষ করতে। বিশ মিনিট পর এনজিন নিরাপদেই নামিয়ে আনল ও, ছোট নৌকা অনেকখানি দেবে গেল জিনিসটার ভারে।

গিলিয়াতের ডোভার অভিযান শেষ, এবার নিশ্চিন্তে গেরানসি যাত্রা করা যায়। না, ভুল হলো। এখনও একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে ওর। দুরান্দের চিমনিটার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ওটাও নিতে হবে। এনজিন নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে চিমনির কথা ভুলেই গিয়েছিল গিলিয়াত। কিন্তু এখনই ওটাকে নৌকায় তোলার উপায়ও নেই।

এ মুহূর্তে দুই ডোভারের একটার সাথে মাথা ও অন্যটার সাথে লেজ ঠেকিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে আটকে আছে জিনিসটা। পানির সাথে তাল রেখে দুলছে। এখন তোলা যাবে না। ভাটার সময় করতে হবে কাজটা।

কিন্তু আবার ভাটা আসতে আসতে তো সেই মাঝরাত। অতরাতে কাজ শেষ করে যাত্রা করা কঠিন হয়ে যাবে। তা হয় হোক, তবু কাজ অসমাপ্ত রেখে ফিরে যেতে রাজি নয় গিলিয়াত। কাজে কোনরকম খুঁত রাখা চলবে না।

একটু বিশ্রাম দরকার। পেটে কিছু দেয়াও জরুরি হয়ে পড়েছে, নইলে আর পারা যাচ্ছে না ও। খুঁজে খুঁজে কয়েকটা কাঁকড়া ধরল গিলিয়াত, তার সাথে কিছু বিস্কিট দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিল। এবার একটু পানি চাই। পানির ভাণ্ডার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ওর বাড়তি কয়েকদিন লেগে যাওয়ায়, এখন খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আজ যে প্রচণ্ড ধকল গেছে, তাতে অন্তত কয়েক ঢোক না খেলেই নয়। কাজেই চামড়ার

ব্যাগটা উপুড় করে কোনমতে গলা ভেজাবার মত খানিকটা খেল গিলিয়াত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠবে বলে এনজিনটার পাশে শুয়ে পড়ল।

নানান উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় গত কয়েক রাত এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারেনি, তাই পাটাতনে পিঠ ছোঁয়ানোমাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও।

কত রাতে কে জানে, হঠাৎ চোখের ওপর তীব্র আলোর ছটা এসে পড়তে গভীর ঘুমটা ভেঙে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসল গিলিয়াত। হতবাক্ হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। এ কিসের আলো!

ভাবসাব দেখে মনে হলো চ্যানেলের প্রতিটা ঢেউয়ের মাথায় আগুন ধরে গেছে বুঝি, আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল। ডোভারের প্রতিটা কোনা কানাচে নেচে বেড়াচ্ছে তার উজ্জ্বল ছটা।

তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকল ও। বুঝে উঠতে পারছে না আলোটার উৎস কি। এমন আজব দৃশ্য জীবনে এই প্রথম দেখল। ভাগ্য ভাল ঘুমটা ভেঙেছিল, ভাবল ও। নইলে আর কিছুক্ষণ পর কি ঘটত বলা যায় না।

হুঁশ ফিরতে দেখল ভাটা শেষ হয়ে আবার জোয়ার এসেছে সাগরে। ওদিকে দুরান্দের চিমনিটা কি করে যেন আগের অবস্থান থেকে ছুটে অনেকটা নিচে এসে নতুন করে আটকে গেছে, ওর মাথার মাত্র কয়েক হাত ওপরে।

পানি বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে ওর নৌকা ক্রমে ওপরে উঠছে। পানি আর এক হাত বাড়লেই এনজিনটা চিমনির সাথে ঠেকে যাবে, ঠেকে যাবে নৌকাও।

পানি বাড়বে অথচ নৌকা জাগবে না, তার ফল কি হতে পারে সহজেই অনুমান করা যায়। ব্যস্ত হয়ে উঠল গিলিয়াত, তাড়াতাড়ি নৌকা সরিয়ে না নিয়ে গেলে বিপদ। যে কাজ অন্য সময়ে দু'মিনিটে করে ফেলতে পারত, ভীষণ ক্লান্ত বলে সেই কাজেই পুরো দশ মিনিট লাগল।

নৌকাটাকে বিপদমুক্ত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, একই সাথে চিমনির আশা ছেড়ে দিল। দরকার নেই ওটার। শুধু এনজিনটা নিয়ে ভালয় ভালয় জায়গামত পৌঁছতে পারলে হয়।

গেরানসি যাত্রা করার জন্যে জোয়ারই উপযুক্ত সময়। এ মুহূর্তে একে তো জোয়ার, তারওপর সাগরও বেশ শান্ত, তাই নৌকা ছেড়ে দেয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কেন যেন সাহস হলো না গিলিয়াতের।

অবাক চোখে আগুন রঙের অদ্ভুত আলোটার খেলা দেখছে ও। এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে বোকার মত। কিছুক্ষণ পর আচমকা মিলিয়ে গেল আলোটা, ঘন আঁধারে ডুবে গেল ধরনী। দূর দিয়ে এক ঝাঁক সামুদ্রিক চিল আতঙ্কিত গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে পালিয়ে গেল।

এ নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বাভাস!

পাখিগুলোর আতঙ্কিত চিৎকার ও পালিয়ে যাওয়ার পড়িমরি ভাব দেখেই বুঝে ফেলেছে গিলিয়াত। ওর সমস্যা আরও বাড়াতে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড ঝড় আসছে! এমনিতে এই অঞ্চলে ঝড়-ঝাপ্‌টা সারাক্ষণ লেগেই থাকে।

সাধারণ ঝড় এখানে কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু অসন্ন ঝড়টা এইমাত্র নিজের আগমনের যে আলামত দেখিয়ে গেল, তাতে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল ও।

অজান্তেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল গিলিয়াতের। না জানি কি ভয়ঙ্কর বিপদের বার্তা নিয়ে আসছে ঝড়টা। নৌকাটাকে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গোড়ার সেই নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে এসে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল ও, তারপর ভয়ে ভয়ে কি ঘটে তা দেখার অপেক্ষায় থাকল।

সকাল হলো। কিন্তু ভীষণ মুখ গোমরা সকাল। চ্যানেল এখন পর্যন্ত শান্তই আছে। সূর্য কিছুক্ষণের জন্যে দেখা দিয়ে গায়েব হয়ে গেল। বাতাস জমাট বেঁধে থাকায় ক্রমে গুমোট হয়ে উঠতে লাগল পরিবেশ। অবশেষে দুপুরের একটু আগে শুরু হলো প্রত্যাশিত ঝড়।

বাতাসের সামান্য ছোঁয়া পেতেই চেহারা বদলে গেল শান্ত ইংলিশ চ্যানেলের—রুদ্র মূর্তি ধরল চোখের পলকে। ভীষণভাবে ফুঁসে উঠল। ক্রুদ্ধ, দানবীয় সাপের মত হাজারটা ফণা তুলে প্রলয় নাচন জুড়ে দিল ডোভারকে ঘিরে।

দুনিয়া আঁধার করা বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টিও শুরু হলো একই সাথে। অন্ধকার আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চিরে দিয়ে সাপের জিভের মত লকলকে, তীব্র নীলচে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, সেকেন্ডে সেকেন্ডে দিনের মত ঝল্‌সে উঠতে লাগল চারদিক। বিরামহীন বাজ পড়ার বিকট, ভয়াবহ শব্দে গিলিয়াতের মত দুঃসাহসী নাবিকেরও বুক কাঁপতে লাগল।

নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় অসহায়ের মত নৌকায় বসে থাকল ও। টানা বিশ ঘণ্টা দুনিয়া ওলট-পালট করা ভয়াবহ তাণ্ডব চালিয়ে অবশেষে থামল ভয়ঙ্কর ঝড়টা। বাতাস, বৃষ্টি, একযোগে থেমে গেল। স্বস্তির দম ছেড়ে নৌকার পাটাতনে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিল গিলিয়াত।

বারো

অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল ওর। সাগর তখন বেশ শান্ত। সময় মত গেরানসিতে পৌঁছতে হলে আরও আগেই রওনা করা উচিত ছিল ওর। তা যখন হলো না, তখন আজ আর যাত্রা করবে না ঠিক করল গিলিয়াত। তারচেয়ে বরং একটা দিন দেরিতে যাত্রা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অসহ্য খিদেয় নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে ওর। সারাদেহ কাঁপছে থর থর করে। ভয় হলো, এখনই কিছু খাবার জোগাড় করতে না পারলে ও বোধহয় মরেই যাবে।

গায়ের জামাটা তখনও একটু একটু ভেজা ছিল, ওটা খুলে ফেলল গিলিয়াত। পাজামাটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে নিজের আরেক সর্বক্ষণের সঙ্গী, লম্বা ফলার ধারাল ছুরিটা নিয়ে নেমে পড়ল নৌকা থেকে। খাওয়ার জন্যে কিছু একটা জোগাড় করতেই হবে ওকে।

নৌকাটা যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছে, তার কয়েক হাত দূরে পাহাড়ের গায়ে বেশ বড়সড় একটা গর্ত। গুহামুখের ওপরে খিলানের মত পাথরের কার্নিশ, সামনের দিকে বেরিয়ে আছে অনেকখানি।

বুক সমান পানি ওখানটায়। ঝড়ের সময় প্রচুর বড় বড় কাঁকড়া আশ্রয় নিয়েছিল গুহার ভেতরে, আগেই লক্ষ করেছে গিলিয়াত। এখনও আছে সেগুলো, বের হতে সাহস পায়নি আবার ঝড় আসতে পারে সেই ভয়ে।

খিলানের নিচ দিয়ে ওকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই মস্ত বড় একটা কাঁকড়া দেয়ালের আশ্রয় ছেড়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পাশ ফিরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে খিঁচে দৌড় লাগাল গুহামুখের দিকে। ওটাই ছিল ওর প্রধান লক্ষ্য, কাজেই পিছু ছাড়ল না।

ওটাকে ধাওয়া করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। গুহাটার আকার দেখে বেশ অবাক হলো গিলিয়াত। বাইরে থেকে কল্পনাই করা যায়নি ওটা এত বড় হতে পারে।

মস্তবড় গুহা। একজন মানুষ অনায়াসে চলাচল করতে পারে ভেতরে। একটু দাঁড়াল ও আবছা অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেয়ার জন্যে। তারপর বড় কাঁকড়াটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

এই সময় গুহার ও মাথায় বেদীর মত উঁচু, শুকনো খানিকটা জায়গা চোখে পড়ল। বাইরে থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ওখানটায়। ব্যাপার বোঝার জন্যে আরও কয়েক পা ভেতরে এগিয়ে দাঁড়াল গিলিয়াত, তখনই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল।

নরম শুঁড়ের মত একটা ঠাণ্ডা হাত পিছনে থেকে আচমকা ওর ডান হাতটা পেঁচিয়ে ধরল শক্ত করে। বরফের মত ঠাণ্ডা হাত! জনপ্রাণীবিহীন নির্জন জায়গায় হঠাৎ এমন অচিন্তনীয় আক্রমণে মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও।

পরমুহূর্তে ভয়ে জান উড়ে গেল হাতটা ওকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করছে বুঝতে পেরে। প্রচণ্ড শক্তিতে টানছে বরফের

মত ঠাণ্ডা হাতটা! সামলে নিয়ে এক পা গুহার দেয়ালে বাধিয়ে নিজেকে ছাড়াবার জন্যে গায়ের জোরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করল গিলিয়াত।

কাজ হলো না। অজ্ঞাত আক্রমণকারীর কঠিন মুঠি এক চুলও শিথিল হলো না তাতে, বরং আরও এঁটে বসল। আরেকটা শুঁড় এসে ওর নগ্ন পেট পেঁচিয়ে ধরল। পরমুহূর্তে মনে হলো, ছোট ছোট অসংখ্য সুঁই পেটের প্রতিটা রোমকূপ দিয়ে রক্ত শুষে নিতে আরম্ভ করেছে বুঝি।

এরমধ্যে আরেকটা শুঁড় এসে বুক পেঁচিয়ে ধরেই চাপ দিতে শুরু করল। চাপের চোটে দম বন্ধ হয়ে এল গিলিয়াতের, ভয় হলো বুকের খাঁচা এখনই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে বুঝি। খানিক পরই নতুন আরও দু'টো শুঁড় এসে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ওকে, নড়াচড়ার উপায় রাখল না তেমন।

দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল ওর, অবশ হয়ে আসতে শুরু করেছে সারাদেহ। এত কিছু ঘটে গেল মাত্র দুই থেকে তিন সেকেন্ডের মধ্যে। আক্রমণকারীকে তখনও পর্যন্ত দেখতে পায়নি গিলিয়াত।

তবে সেটা যে কি হতে পারে, তা বুঝে নিতে কষ্ট হলো না। সাগরে এমন প্রাণী একটাই আছে, তার নাম অক্টোপাস–যার খপ্পরে পড়ার অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যু।

তবে ভরসার কথা যে ওর ছোরা ধরা বাঁ হাত আর ঘাড় এখনও মুক্ত আছে। এ পর্যন্ত পাঁচটা শুঁড় কাজে লাগিয়েছে অক্টোপাসটা, আরও তিনটে কাজে লাগাতে বাকি। তার আগেই রুখে দাঁড়ানো না গেলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। ওটা কোথায় আছে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল ও।

গুহায় ঢুকতেই বাঁ দিকে একটা ছোট গর্ত আছে; কাঁকড়ার দিকে নজর থাকায় আগে খেয়াল করেনি গিলিয়াত, সেটার মধ্যে বসে আছে অক্টোপাসটা–নাগালের মধ্যেই। ড্যাব্‌ড্যাব্ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সে কী ভয়ঙ্কর চাউনি!

দু'চোখ জ্বল জ্বল করছে সাক্ষাৎ শয়তানটার, খুব সম্ভব শিকার ধরার আনন্দে। বিশাল ধড়, এতবড় অক্টোপাস আগে কখনও দেখেনি গিলিয়াত। পাঁচটা শুঁড় স্থির ওটার, ওকে ধরে রেখেছে বলে টান্‌টান্ হয়ে আছে। বাকি তিনটা কিল্‌বিল্ করছে শূন্যে, যে কোন মুহূর্তে কাজে লেগে পড়বে ওগুলোও।

পাকড়াও কর্ম সম্পন্ন হলে ধড়টা ওর দিকে এগিয়ে নিয়ে আসবে ড্যাব্‌ডেবে শয়তানটা, বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে একসঙ্গে আটটা শুঁড় দিয়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে যাতে দম বন্ধ হয়ে আসে গিলিয়াতের। তারপর মৃত্যু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার।

লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে বাঁ হাতে ধরা ছোরাটা বিদ্যুৎ গতিতে শয়তানটার দুই চোখের মাঝখান দিয়ে চালিয়ে দিল গিলিয়াত, একেবারে মগজে ঢুকিয়ে দিল ওটার দীর্ঘ ফলা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল অক্টোপাস, শুঁড়ের বাঁধনগুলো শিথিল হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আরেকবার আঘাত করার জন্যে ছুরি খসাতে হাত টান দিল গিলিয়াত, কিন্তু তার আর দরকার হলো না। টান খেয়ে গর্তের মুখের দিকে খানিকটা এগিয়ে এল সাগর-দানবটা, তারপর প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মত ধীর গতিতে পানিতে গড়িয়ে পড়ল। শুঁড়গুলো কুঁকড়ে আছে যন্ত্রনায়। ওই অবস্থায়ই ধোঁয়ার মত রক্ত ছাড়তে ছাড়তে তলিয়ে গেল ওটা। অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছে বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল গিলিয়াত। প্রচণ্ড উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। শুঁড় দিয়ে ওর হাত, বুকসহ যেখানে যেখানে ধরেছিল অক্টোপাসটা, সে সব জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, খুব জ্বালা করছে।

সমুদ্রের লবণ পানি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জায়গাগুলো ডলে ডলে ধুয়ে নিল ও। জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা কমে আসতে সামনে নজর দিল। সুড়ঙ্গের ভেতরে বেদীর মত যে শুকনো জায়গাটা দেখতে পেয়েছিল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে।

জায়গাটা বেশ উঁচুতে, তাকের মত–বেশ খানিকটা লম্বা এবং শুকনো। দেখে মনে হলো মাত্রাছাড়া জোয়ার না এলে ওই পর্যন্ত পৌঁছায় না পানি। কাঁকড়াটা নিশ্চয়ই ওখানে আছে ভেবে এগোল গিলিয়াত।

পাহাড়ের ফাঁক-ফোকর দিয়ে আসা সূর্যের আলোয় মোটামুটি দেখা যাচ্ছে তাকটা। খানিকটা এগোতেই হঠাৎ ওটার ওপরে অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখতে পেয়ে থমকে গেল ও।

গা ছমছম করে উঠল। চোখ কুঁচকে তাকাল। কি ওটা!

মনে হলো একজন মানুষ যেন শুয়ে আছে তাকটার ওপরে, দু' পাটি ধপধপে সাদা দাঁত বের করে বিকট হাসি হাসছে। একটু থেমে থেকে সাহসে ভর করে আবার এগোল ও।

এবার পরিষ্কার দেখতে পেল জিনিসটাকে। মানুষই বটে, তবে জীবীত নয়–মৃত। একটা নরকঙ্কাল। ওটার চারপাশে স্তূপ হয়ে আছে অজস্র মৃত কাঁকড়ার খোসা, নরকঙ্কালটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে ওগুলো। বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল গিলিয়াতের। কিছু সময় হাঁ করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

এখানে নরকঙ্কাল আসে কি করে? ভাবল ও। সময় নষ্ট না করে তাকটার দিকে এগিয়ে গেল।

দু'হাতে কাঁকড়ার খোসা সরিয়ে কঙ্কালটাকে দেখল ভাল করে। কোন এককালে ওটা কোন মানুষেরই ছিল, এই সত্যটা ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করতে পারল না ও। তবে কঙ্কালটার কোমরে চামড়ার চওড়া একটা বেল্ট দেখতে পেল।

লোহার বাকলে জং ধরা ছাড়া অন্য কোন ক্ষতি হয়নি বেল্টটার। টাকা-পয়সাসহ ছোটখাট জিনিসপত্র রাখার জন্যে ওটায় কয়েকটা খোপ আছে। তার মধ্যে একটা বেশ ফুলে আছে দেখে খুলল ও, ভেতর থেকে বের হলো একটা লোহার তৈরি মানিব্যাগ।

একটা নাম খোদাই করা আছে ওটায় ঃ ক্লুবিন।

ওটাতেও মরচে ধরে গেছে, তবে স্প্রিঙের কল-কব্জা কাজ করছে ঠিকমতই। ব্যাগটা খুলল গিলিয়াত, খুলেই অবাক হয়ে গেল ভেতরে পনেরো হাজার ফ্রাঁর পাঁচটা নোট দেখতে পেয়ে!

এখনও ভাল আছে টাকাগুলো! নষ্ট হয়নি। কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেল ব্যাগে। গুনে দেখল ও, মোট একুশ গিনি। বেল্টটা কঙ্কালের কোমর থেকে খুলে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল গিলিয়াত। চিন্তিত।

তেরো

নৌকায় উঠেই মাথা ঘুরে গেল গিলিয়াতের। কখন কি ভাবে ওটার তলা ফুটো হয়ে গেছে, কে জানে! হড়হড় করে পানি উঠছে। এর মধ্যেই এক হাঁটু পানি জমে গেছে খোলের ভেতরে। এখনই ফুটো বন্ধ করতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। গিলিয়াতের এতদিনের অমানুষিক পরিশ্রম বরবাদ হয়ে যাবে।

দিনের বাকি সময়টা ওই ফুটো বন্ধ করতেই কেটে গেল ওর। তাও তেমন সন্তোষজনক হলো না কাজটা। পুরো এক বেলা পরিশ্রম করে কাপড়চোপড়ের তালি মেরে একবার ওটা প্রায় মেরামত করে এনেছিল, এমন সময় আবার ছুটে গেল।

নতুন করে পানি ওঠা শুরু হতে ফের একই বিরক্তিকর কাজে হাত লাগাতে হলো ওকে। সঙ্গে যত কাপড়চোপড় ছিল, এবার তার সবই কাজে লাগাল গিলিয়াত। প্রচণ্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও সে রাতে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও ঘুমাতে পারল না গিলিয়াত, নানান উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এলই না ঘুম।

পরদিন ভোর হতে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিল, তারপর প্রস্তুত হলো তিন সপ্তাহের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল

নিয়ে স্যামসনে ফিরে যাওয়ার জন্যে। তখন আর চেনার জো নেই গিলিয়াতকে। অনাহার, অনিদ্রা আর অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে শুকিয়ে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে, পাঁজরের হাড় সব ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোখ বসে গেছে কোটরে।

তবে এতকিছুর পরও সাফল্যের আনন্দে ঝলমল করছে ওর চোখমুখ। চোখের সামনে দেরুশেতের মোহনীয় মুখটা ভেসে উঠছে একটু পর পর। ওর সেদিনের উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার প্রতিটা শব্দ কানে বাজছে।

বহুদিন পর নিজের প্রিয় গানটা গুন্ গুন্ করে গেয়ে উঠল গিলিয়াত। ডোভার পাহাড়ের আশেপাশে সে সময় যদি কেউ থাকত, ওর সেই হৃদয় কাড়া কোমল, মিষ্টি সুর নিশ্চয়ই তার অন্তর ছুঁয়ে যেত।

***

স্যামসনে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। কারণ, সেইন্ট পিটার গির্জায় কড্রে নামে যে নতুন রেভারেন্ড এসেছে কিছুদিন আগে, সে নাকি হঠাৎ করে অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে।

লন্ডনে তার এক মামা ছিল, মস্ত বড়লোক। কড্রে ছাড়া আপনজন বলতে কেউ ছিল না তার। সেই মামা মারা গেছে, এবং তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে সে এখন তার যাবতীয় টাকা-পয়সা, জমিজমা ইত্যাদির একমাত্র মালিক। আজই কড্রের মামার মৃত্যুর খবর এসেছে স্যামসনে।

লন্ডন থেকে আসা কাশমির নামের এক জাহাজে এ খবর এসেছে, সেই সাথে কড্রেকে অনতিবিলম্বে লন্ডনে যাওয়ার অনুরোধও। মামার শেষকৃত্যে যোগ দেয়া এবং তার সবকিছু

বুঝে নিতে তার যাওয়া খুব জরুরি। দেরি করার উপায় নেই, তাই প্রস্তুতি নিতে লাগল রেভারেন্ড।

এর কয়েকদিন আগের ঘটনা। বুড়ো লেতিয়ারির নামে সীলগালা করা একটা চিঠি এল। খামের ওপর পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের ছাপ। বেশ কৌতূহল নিয়ে খামটা খুলল সে। বেশি বড় নয় চিঠিটা–ডেটলাইন লেখা রয়েছে ১০ মার্চ। চিঠিটার বক্তব্য এরকম ঃ

মঁশিয়ে লেতিয়ারি,

এত বছর পর আমার চিঠি পেয়ে আপনি নিশ্চয়ই খুব অবাক হবেন। বিশেষ একটা খবর আপনাক জানানো জরুরি ছিল বলে চিঠি না লিখে উপায় ছিল না। এ মুহূর্তে তামোলিপা নামের এক জাহাজে লিসবনের পথে রয়েছি আমি।

গেরানসির একজন নাবিক আছে, সে দেশে ফিরে আপনাকে একদিন আমার এ চিঠি পৌঁছে দেবে, সেই ভরসায় লিখতে বসেছি। কথাটা হলো আমি আপনার সমস্ত টাকা ফেরত দিয়েছি। কয়েক বছর আগে বিশেষ পরিস্থিতিতে পড়ে আপনার পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ আমি ধার হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলাম। মাসখানেক আগে সেইন্ট ম্যালো বন্দরে আপনার বিশ্বস্ত কর্মচারী ক্লুবিনের সাথে দেখা হয় আমার, তখন সেই পঞ্চাশ হাজার এবং তার সূদ হিসেবে আরও পঁচিশ হাজার, মোট পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁ তার হাতে তুলে দিয়েছি আমি। পনেরো হাজার ফ্রাঁর পাঁচটা নোটে। আপনার প্রতিনিধি হিসেবে টাকাটা বুঝে নিয়েছে ক্লুবিন। কাজেই আমি এখন দায়মুক্ত।

খবরটা আপনার জানা দরকার বলে এ চিঠি লিখলাম। আর একটা কথা, টাকাটা নেয়ার ব্যাপারে ক্লুবিনকে অতিরিক্ত উৎসাহী মনে হয়েছে আমার। সে সময় তার হাতে গুলি ভরা পিস্তলও ছিল, তাই টাকা প্রাপ্তির রসিদ চাইতে সাহস হয়নি আমার।

– আপনার বিশ্বস্ত রাতাগ।

চিঠি পড়া শেষ হতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল লেতিয়ারি, প্রায় বিস্মৃত বিশ্বাসঘাতকটার কথা ভাবছে। ক্লুবিন সম্পর্কেও একটা বিচ্ছিরি সন্দেহ ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। গত কিছুদিন থেকে গ্রামের লোকজন তাকে নিয়ে নানান সন্দেহজনক কথাবার্তা বলাবলি করছে।

সবই কানে এসেছে লেতিয়ারির। তাদের ধারণা, ক্লুবিন নাকি ইচ্ছে করেই দুরান্দকে দুর্ঘটনায় ফেলেছে। অথচ সবাইকে বোঝতে চেয়েছে এ ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না। আসলে সে-ই সম্পূর্ণ দায়ী এ জন্যে। ওটাকে ডুবিয়ে দিয়ে লোকজন সবাইকে লাইফবোটে করে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছে বদমাশটা।

কিন্তু আসলে পরে কোন একসময় পালিয়ে গেছে হ্যানওয়ে থেকে। এই চিঠির বক্তব্য তাদের ধারণাকেই সমর্থন করছে বলে সন্দেহ আরও হাজারগুন বাড়ল বৃদ্ধের। টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতলবেই তার এতবড় একটা সর্বনাশ ঘটাতেও পিছপা হয়নি ক্লুবিন লোকটা।

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই হঠাৎ করে খুব গম্ভীর হয়ে উঠল লেতিয়ারি। কারও সাথেই কথাবার্তা তেমন একটা বলে না। একা একা থাকে সারাক্ষণ, কি যেন চিন্তা করে। যেদিন কড্রের মামার মারা যাওয়ার খবর এল, সেদিন আগের চেয়ে অনেক বেশি গম্ভীর দেখা গেল তাকে।

রাতে পূর্ণ চাঁদের আলোয় গোটা স্যামসন ঝলমল করছে দেখে দেরুশেতকে নিয়ে বাগানে হাঁটাহাঁটি করতে এল লেতিয়ারি। কিন্তু একটু পরই ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে, ঘুম পেয়েছে বলে ভাইঝির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

দেরুশেত তার এই অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হলেও কিছু বলল না। ও লক্ষ করেছে, গত কিছুদিন থেকেই বাবা যেন কেমন হয়ে উঠেছে, অন্য কারও সাথে তো নয়ই, এমনকি ওর সাথেও পর্যন্ত ঠিকমত কথা বলে না।

ওর ধারণা, প্রিয় দুরান্দের কথা ভেবে মন খারাপ করেছে বোধহয় লেতিয়ারির। তারওপর আজ খুব ক্লান্তও দেখাচ্ছিল তাকে, তাই কিছু জিজ্ঞেস করল না ও। একাই পায়চারী করতে থাকল বাগানে।

ওদিকে গভীর রাতে কেন যেন হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল লেতিয়ারির। মাথা ঘোরালেই জানালা দিয়ে বন্দর দেখা যায়, চোখ মেলে অভ্যেসবশে আনমনে সেদিকে তাকাল সে। যতদূর চোখ যায় চাঁদের আলোয় কাঁচের মত চকচক করছে সাগর।

প্রথমে বোধহয় কিছুটা আনমনা ছিল বৃদ্ধ, একটু পর হঠাৎ অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য চোখে পড়তে ধড়মড় করে উঠে বসল। বন্দরের কাছে পানিতে কি ভাসছে ওটা? জাহাজের চিমনির মত

মনে হচ্ছে না! ভাল করে চোখ রগড়ে আবার তাকাল লেতিয়ারি–হ্যাঁ, তাই তো! একটা চিমনিই তো" ঠিক তার দুরান্দের চিমনির মত।

দুরান্দ ছাড়া এই অঞ্চলের আর কোন জাহাজের এরকম চিমনি নেই। তাহলে কি আর স্থির থাকতে পারল না লেতিয়ারি, এক হাতে একটা লণ্ঠন ও অন্য হাতে ছড়িটা নিয়ে পাগলের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে।

হোঁচট খেতে খেতে বন্দরের দিকে ছুটল। ওখানে পৌঁছে যা দেখল, তাতে কেবল নড়াচড়াই ভুলে গেল না বৃদ্ধ, ভাষাও হারিয়ে ফেলল। নিজের চোখকেও সন্দেহ হতে লাগল তার।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি না তো আমি? ভাবল সে। কারণ শুধু চিমনি নয়, দুরান্দের গোটা এনজিনটাও রয়েছে ওখানে–জেটিতে বাঁধা ছোট একটা নৌকার ওপর। চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করছে ওটার ধাতব দেহ। কয়েকবার ভাল করে চোখ রগড়ে দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হলো বৃদ্ধ, না, ভুল দেখেনি সে। যা দেখছে সে, জিনিসটা আসলেই তাই।

এবার নৌকাটাকে দেখল সে। বুঝল, এরকম নৌকা একটাই আছে গেরানসিতে। এবং আর সবার মত ওটার মালিকও তার খুবই চেনা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে গিলিয়াতকে খুঁজল সে, কিন্তু কোথাও নেই সে। বন্দর-জেটি সব খাঁ খাঁ করছে।

ওকে খোঁজার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল বৃদ্ধ, বাতের ব্যথা ভুলে বাচ্চা ছেলের মত লাফাতে লাফাতে নৌকায় গিয়ে উঠল হাতের লণ্ঠন নাচাতে নাচাতে।

মহাব্যস্ত হয়ে এনজিন পরীক্ষা করতে লাগল। আনন্দে, উত্তেজনায় সারাদেহ কাঁপছে থর থর করে, ফোঁপাচ্ছে। ঠিকই

আছে এনজিনটা, পরীক্ষা শেষ করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল লেতিয়ারি, কোন ক্ষতি হয়নি। প্রতিটা স্ক্রু পর্যন্ত আগের মতই আছে। তাহলে আর চিন্তা কি? অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠল লেতিয়ারি। এনজিনের যখন কিছুই হয়নি, তাহলে আর ভয় কিসের?

শুধু একটা খোল তৈরি করিয়ে নিলেই তো তার নতুন আরেকটা জাহাজ হয়ে গেল! আবার নতুন করে জাহাজ ব্যবসা শুরু করতে পারবে সে। আবার আগের মত

ঘুমে বিভোর বন্দর কাঁপিয়ে পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠল লেতির্য়ারি। নিস্তব্ধ রাত চমকে উঠল সে শব্দে। দীর্ঘসময় ধরে বাতাসে ভেসে বেড়াল তার অট্টহাসি, তারপর ক্রমান্বয়ে দূর থেকে বহুদূরে মিলিয়ে গেল।

'কে কোথায় আছ!' চিৎকার করে উঠল সে, ছুটে গিয়ে জেটির ঘণ্টীর শেকল ধরে টানতে শুরু করল। বিকট ঢং! ঢং! ঢং! ঢং! শব্দে আবার কেঁপে উঠল স্যামসন। থামার নাম নেই লেতিয়ারির, ঘণ্টী বাজিয়ে চলেছে একনাগাড়ে। তার ইচ্ছে, ঘুম ভেঙে যাক গ্রামের সবার, বন্দরে ছুটে আসুক তারা।

এসে দেখুক, লেতিয়ারির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খুশিতে পাগল হয়ে গেছে সে।

চোদ্দ

মাঝরাতের খানিক পর বন্দরে এসে পৌছল গিলিয়াত। গোটা গ্রাম চাঁদের আলো মেখে হাসছে তখন। চারদিক নীরব, নিঝুম। কোথাও কেউ জেগে আছে বলে মনে হয় না। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। জেটির যেখানটায় দুরান্দ বাঁধা থাকত, সেখানে নৌকাটা শেকল দিয়ে কষে বাঁধল গিলিয়াত।

তীরে নেমে এসে ভাবল, এতরাতে কাউকে ডাকাডাকি করে কাজ নেই। নৌকা থাকুক এখানে, সকালে এসে যা করার করা যাবে। গ্রামমুখী রাস্তাটা ধরে ধীরপায়ে বাড়ির দিকে হেঁটে চলল গিলিয়াত। লেতিয়ারির বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কৌতূহল বশে বাগানের দেয়ালের কাছে দাঁড়াল।

এতরাতে দেরুশেতকে বাগানে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, তবু যদি পাওয়া যায়, এই ভেবে আইভি লতায় ছাওয়া নিজের বিশেষ জায়গাটায় এসে দাঁড়াল ও। জায়গাটা পথের বাঁকের মুখে। এবং নির্জন। তার ওপর লতায় লতায় ছাওয়া

বলে এখানে দাঁড়ালে সহজে কারও দেখে ফেলারও উপায় নেই। সেখান থেকে ভেতরে তাকাল গিলিয়াত।

কে যেন বসে আছে না বাগানের বেঞ্চটায়, একা? হ্যাঁ, তাইতো! বেঞ্চটার কাছেই বড় একটা গাছ আছে, চাঁদের আলো আড়াল করে রেখেছে বলে পরিষ্কার দেখা না গেলেও ওটা যে মানুষের কাঠামো, তা ঠিকই বোঝা যায়।

ওটা দেরুশেত না আর কেউ, তখনই বুঝে উঠতে পারল না গিলিয়াত। অবশ্য একটু পর বুঝল আর কেউ নয়, ওটা দেরুশেতই। চুপচাপ বসে আছে, ডান হাতের ওপরে গাল রেখে বিভোর হয়ে কি যেন ভাবছে। সব ভুলে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকল গিলিয়াত।

হঠাৎ কাছেই কোথাও একটা আওয়াজ উঠতে দেরুশেত ও গিলিয়াত একযোগে চমকে উঠল। নজর ঘোরতে একটা ছায়া চোখে পড়ল গিলিয়াতের–বাগানের মধ্যে দিয়ে দ্রুত পায়ে বেঞ্চটার দিকে এগোচ্ছে।

একজন পুরুষ মানুষ!

লেতিয়ারি নয়, দেখামাত্র বুঝে ফেলেছে গিলিয়াত, এ অন্য কেউ। কিন্তু কে? বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলল ওর। এত রাতে নির্জন বাগানে কে এসেছে তার দেরুশেতের সাথে দেখা করতে?

গিলিয়াতের বিস্মিত চোখের সামনে চট্ করে ওর পাশে বসে পড়ল লোকটা। মেয়েটি এক পলক তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল, মনে হলো আবার নিজের ভাবনায় ডুবে গেছে। তবে স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটি ওর অচেনা কেউ নয়। আর তার এই নিশি অভিসারও ওর কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়।

মানুষটাকে চেনার চেষ্টা করল ও, কিন্তু গাছের ছায়ার জন্যে পারল না। তাছাড়া নতুন করে একটু একটু মেঘও জমতে শুরু করেছে আকাশে, বারবার চাঁদের সামনে আড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে খণ্ড খণ্ড মেঘ।

একটু পর আগন্তুকের গলা শুনতে পেল গিলিয়াত। আবেগ মাখা গলায় বলল লোকটা, 'দেরুশেত, সারা স্যামসনে এখন তোমার-আমার বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। লোকে বলে, আগে নাকি কখনও এই সময় তুমি একা একা বাগানে বসে থাকতে না। আমি এতদিন ধরে রোজ তোমার কাছে আসছি, কিন্তু আমার মনের কথা খুলে বলার মত সাহস পাইনি কোনদিন।

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বোঝ সেটা কি। কাল সকালে আমি লন্ডনে চলে যাচ্ছি। দুই-একদিনের জন্যে হলেও যেতেই হবে। তাই আজ বিশেষ করে তোমার কাছে এসেছি।'

একটু থামল লোকটা। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'এতদিন আমি গরীব ছিলাম, তাই নিজেকে তোমার উপযুক্ত ভাবতে পারিনি।

'কিন্তু আজ আর গরীব নই আমি, মামা মারা যাওয়ায় তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়ে গেছি।. অনেক ধনী আজ আমি। তাই যাওয়ার আগে আরেকবার বলতে এসেছি, আমি তোমাকে ভালবাসি, দেরুশেত।

'আমি জানতে চাই, তুমিও আমাকে ভালবাসো কিনা? তুমি ছাড়া আর কোন মেয়েকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ভাবতে পারি না আমি। তুমি আমার জীবন-মরণ, তুমিই আমার সব। বলো,

দেরুশেত, যে তোমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তুমি তাকে ভালবাসো কিনা?'

মাথা নিচু করে বসে ছিল দেরুশেত, তেমনিই থাকল। মৃদু স্বরে কেবল বলল, 'কিন্তু আমি যে মনে মনে নিজেকে তার পায়ে সঁপে দিয়েছি!'

কথা ক'টা এতই মৃদু স্বরে বলল ও যে পাশে বসা প্রেম নিবেদনকারীটি পর্যন্ত শুনতে পেল না। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, কয়েক হাত দূরে থেকেও গিলিয়াত প্রতিটা শব্দ একদম স্পষ্ট শুনতে পেল।

'চুপ করে রইলে যে, দেরুশেত?' পুরুষটি বলল। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না?'

'কি উত্তর দেব, বলো?' তেমনি মৃদু গলায় বলল ও।

'আমি তোমার পরিষ্কার জবাব চাই, দেরুশেত!'

'ঈশ্বর শুনেছেন আমার উত্তর,' দেরুশেত বলল। 'আমাকে আর জিজ্ঞেস কোরো না।'

একটু পর মেঘ সরে যেতে বাগানের রাস্তার ওপর দু'টো ছায়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল গিলিয়াত, বোকার মত অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সেদিকে। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঘুরছে ওর, পা টলছে। কষ্ট হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকতে।

এমন সময় দূর থেকে লেতিয়ারিকে চিৎকার করে উঠতে শুনল ও, 'কে কোথায় আছ!' পরক্ষণে ঢং! ঢং! ঢং! ঢং! করে জেটির ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার কিছু সময় বাগানের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল

গিলিয়াত। তারপর রিক্ত, পরাজিতের মত মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে বন্দরের দিকে ফিরে চলল।

একটু পর ঘণ্টা বাজানো থামিয়ে জেটি থেকে নেমে এল লেতিয়ারি, সামনে তাকিয়ে দেখল কে যেন তার দিকে আসছে। একটু কাছে আসতে চিনল তাকে বৃদ্ধ, ওটা গিলিয়াত। ছড়ি, লণ্ঠন ফেলে পাগলের মত ছুটে গেল লেতিয়ারি। ওকে দু'হাতে বুকে জাপটে ধরল। অন্তরের সমস্ত কৃতজ্ঞতা উজাড় করে অনেক কিছুই বলতে চাইল বৃদ্ধ, কিন্তু প্রচণ্ড আবেগে গলা বুজে গেল, কিছুই বলা হলো না।

গিলিয়াতের মুখের দিকে চেয়ে থাকল কেবল। একটুপর হুঁশ হতে টানতে টানতে ওকে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল। বৈঠকখানায় ওকে জোর করে সোফায় বসিয়ে নিজে বসল একটা চেয়ারে। এতক্ষণে যেন ভাষা খুঁজে পেল বৃদ্ধ।

কান্নাভেজা আবেগ মাখা কণ্ঠ বলতে লাগল, 'গিলিয়াত! গিলিয়াত!! জানো, বাবা! আমার মন বলত এ কাজ যদি কাউকে দিয়ে কোনদিন সম্ভব হয়, তাহলে কেবল তোমাকে দিয়েই হবে। আর কাউকে দিয়ে না, বাবা। তুমি ডোভার চলে যাওয়ার পর সবাই বলাবলি করত, "গিলিয়াত একটা ছন্নছাড়া, ভবঘুরে। কাজ নেই কাম নেই সারাদিন বাঁশি বাজিয়ে আর টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, ওই ছোকরা যাবে দুরান্দের এনজিন উদ্ধার করতে? তাহলে আর চিন্তা ছিল কি"?

'কিন্তু আমি জানতাম, বাবা! আমি জানতাম। আমার মন বলত তুমি পারবে, কিন্তু তারপরও মাঝেমধ্যে বিশ্বাস হতে চাইত না। ওই ছোট নৌকাটা নিয়ে যেদিন তুমি ডোভার যাবে বলে চলে গেলে, আর সবার মত আমারও বিশ্বাস করতে মন

চাইছিল না তুমি সত্যিই সেখানে যাচ্ছ। লোকে বলত, ''লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে ডোভার গেছে! দেখোগে' আর কোথাও হাওয়া খেতে গেছে"।' কথায় পেয়েছে যেন বৃদ্ধকে, একনাগাড়ে বলেই চলেছে সে। 'তারপর এক মাসের মত হয়ে গেল তোমার খবর পাইনি। তাই আমিও আশা-ভরসা ছেড়েই দিয়েছিলাম, বাবা।'

প্রচণ্ড আবেগে গলা বুজে এল তার। একটু পর সামলে নিয়ে আবার শুরু করল, 'গিলিয়াত! গিলিয়াত!! সত্যিই তুমি ডোভারে গিয়েছিলে, বাবা? এতবড় এক দুঃসাধ্য কাজ একা কিভাবে সম্ভব করলে তুমি? এতক্ষণ জেটিতে এনজিনটা পরীক্ষা করছিলাম আমি, কিছুই হয়নি ওটার। একদম আগের মত আছে। একটা স্ক্রুও নষ্ট হয়নি। সেই বয়লার, সেই চিমনি, সেই এনজিন, সবকিছু অবিকল আগের মতই আছে।'

থামল বৃদ্ধ, চকচকে চোখে সামনে বসা যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকল ও কিছু বলবে ভেবে। কিন্তু গিলিয়াত কিছু বলছে না, একদম চুপ করে বসে আছে।

মাথা নাড়ল লেতিয়ারি। তারপর যেন এইমাত্র মনে পড়েছে, এমনভাবে আবার শুরু করল, 'ও হ্যাঁ। দুরান্দের দুর্ঘটনা যে ইচ্ছে করে ঘটানো হয়েছে, সে কথা শুনেছ তো? এর সবটাই আসলে বিশ্বাসঘাতক ক্লুবিনের ষড়যন্ত্র, বুঝলে?

'যাত্রা করার আগের রাতে ক্লুবিন কায়দা করে এক নাবিককে মদ খাইয়ে পুরো মাতাল করে নিয়েছিল, জানো? পরদিন তাকেই জাহাজের হাল ধরার দায়িত্ব দেয় ও। যাকগে'। সে অনেক কথা, পরে সব বলব তোমাকে।'

সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল বৃদ্ধ। 'যাক, এনজিনটাই যখন ফিরে পেলাম, আর ভয় কি? এবার ডানযিগ থেকে ভাল কাঠ আনিয়ে নতুন করে আবার জাহাজ তৈরি করাব আমি। দুরান্দের চেয়ে আরও বিশ ফুট বড় হবে এবারেরটা।

'তারপর আবার আমার জাহাজ সাগরে ভাসবে, তুমি হবে তার নতুন ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ, গিলিয়াত। তুমিই হবে আমার নতুন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

''তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না আমি। আহা! আজ যদি আমার সেই পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁ থাকত, এখনই কাজে লেগে পড়তাম আমি। ক্লুবিন যে ফেরার, সে কথা জানো? শয়তানটার কোন খোঁজ নেই। রাতাগ আমাকে চিঠি লিখেছে, জানো? ওর কাছ থেকে আমার নাম করে মোট পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঁ নিয়ে পালিয়ে গেছে হারামজাদা।'

এতক্ষণ অন্য জগতে ছিল গিলিয়াত, কোন গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল, লেতিয়ারির শেষ কথাগুলো কানে যেতে নড়ে উঠল। নীরবে পকেট থেকে ক্লুবিনের সেই বেল্টটা বের করল, লোহার মানিব্যাগ থেকে নোটগুলো বের করে বৃদ্ধের সামনের টেবিলে বিছিয়ে রাখল। টাকার পাশে ব্যাগটাও।

অনেকক্ষণ ধরে বিস্ফারিত দু'চোখ মেলে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধ। চরম বিস্ময়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, চোয়াল ঝুলে পড়েছে তার। এসব কি সত্যি! এনজিন, টাকা, সবই ফেরত পেয়েছে সে?

কিছুই তাহলে খোয়া যায়নি? টাকাগুলো ধরে দেখল লেতিয়ারি। সত্যিই তো! এই তো সেই পনেরো হাজার ফ্রাঁর

পাঁচটা নোট-চিঠিতে রাত্যাগ যেগুলোর কথা লিখেছিল! অর্থাৎ গ্রামের মানুষের ধারণা মিথ্যে ছিল না!

'আমার টাকাগুলোও উদ্ধার করে এনেছ তুমি?' গলা ভেঙে গেল বৃদ্ধের। কৃতজ্ঞতার পানিতে চোখ ভিজে উঠেছে। গলা কিছুতেই বাগে রাখতে পারছে না সে, কাঁপছে।

'তুমি কি মানুষ, গিলিয়াত? যে ডোভারে যাওয়ার কথা মানুষ ভাবতেও ভয় পায়, সেখানে একা গিয়ে আমার দুরান্দের এতবড় এনজিনটাকে নিয়ে এসেছ! তার ওপর আবার টাকাগুলোও? বাবা, সত্তর বছরের জীবনের প্রায় ষাট বছরই সাগরে ঘুরে কেটেছে আমার, কিন্তু এমন ঘটনা আজই প্রথম দেখলাম।

'পরের টাকা হাতে পড়লে তা কেউ ফেরত দেয়, সে অভিজ্ঞতাও জীবনে এই প্রথম আমার। গিলিয়াত, তোমার শরীর কি রক্ত-মাংসের না, বাবা? তুমি কি এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে বড় হওনি? টাকার লোভ বলে কিছুই কি নেই তোমার মধ্যে?'

চোখ নামিয়ে ক্লুবিনের নাম লেখা বেল্ট ও মানিব্যাগটা দেখল লেতিয়ারি। মাথা দোলাল। 'বুঝতে পেরেছি। এর অর্থ হচ্ছে দুরান্দকে ডোবাতে গিয়ে ওই হারামজাদা নিজেও মরেছে! তাই না, গিলিয়াত?'

ও আগের মতই চুপ করে বসে আছে। একটা কথাও বলেনি এ পর্যন্ত। ক্লান্ত দু'চোখ স্থির, কিন্তু জাগতিক কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। কোনও সুদূরের অজানালোকের পানে তাকিয়ে আছে যেন। লেতিয়ারির সেদিকে খেয়ালই নেই, সে আপনমনে নিজের কথাই শুধু বলে চলেছে।

'দেখো, বাবা, সত্যি কথাটা স্বীকার করার এখনই উপযুক্ত সময়। স্বীকার না করলে মহাপাপ হবে আমার। তুমি যে সত্যি সত্যিই ডোভারে গিয়েছিলে, অন্যদের মত আমিও কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিনি।

'ভেবেছিলাম তোমার ভবঘুরে স্বভাব, হয়তো ক'দিন কাটিয়ে আসতে আর কোথাও গিয়েছ।' এক মুহূর্তের জন্যে থামল বৃদ্ধ। 'গিলিয়াত, তুমি আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও, বাবা। এতদিনেও আমরা কেউই আসলে তোমাকে চিনতে পারিনি,' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল সে।

'এবার তুমি আমার দেরুশেতকে বিয়ে করো। জীবনের শেষ ক'টা দিন তোমাদের দু'জনকে নিয়ে একসাথে কাটাতে চাই আমি। একটু শান্তিতে থাকতে চাই।'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল গিলিয়াত, দুর্বল পা দু'টো দেহের ভার সইতে পারছে না। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল ও, 'না, মঁশিয়ে, তা হয় না।'

চমকে উঠল বৃদ্ধ মুখ তুলে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। 'কি হয় না, বাবা?'

'আমি দেরুশেতকে বিয়ে করতে পারবো না।'

'কেন, বাবা?' ভীষণ অবাক হলো বৃদ্ধ। 'হঠাৎ এ কথা কেন? আমার দেরুশেত কি কোনদিক থেকে তোমার অযোগ্য?'

'না, মঁশিয়ে।'

'তাহলে?'

'আমি আমি, মানে, দেরুশেতকে ভালবাসি না, মঁশিয়ে। তাই ...

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বিস্মিত লেতিয়ারি। দু'হাত প্যান্টের

পকেটে ভরে কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, তারপর আচমকা হা হা করে হেসে উঠল। হাসির দমকে বৃদ্ধের শীর্ণ দেহ বারবার বাঁকা হয়ে উঠতে লাগল। কি বললে?' অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল বৃদ্ধ। 'কি বললে তুমি, গিলিয়াত? আমার দেরুশেতকে তুমি ভালবাসো না? গিলিয়াত, এতবড় একটা মিথ্যে কথা তুমি আমার সামনে বলতে পারলে?

'এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো তুমি? দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে এই মাথার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা গেছে, বাবা! জীবনে হাজারো ঘটনা দেখেছে এই দুই বুড়ো চোখ। তুমি এই চোখকে আজ ফাঁকি দিতে চাইছ?

'গভীর রাতে বহুদিন তোমার বাড়ির দিক থেকে বাঁশির করুণ সুর ভেসে আসতে শুনেছি আমি। কাকে শোনাবার জন্যে তুমি ওভাবে বাঁশি বাজাতে, আমি বুঝি না? কাকে আপন করে পেতে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তুমি ডোভারের মত-ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জায়গায় গিয়েছিলে, পুরো একটা মাস ঝড়-তুফান আর খিদে-তেষ্টার অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করে এনজিনটা নিয়ে এলে, আমি তা বুঝি না ভেবেছ? এত কষ্ট করেছ তুমি কেবল এই বুড়োকে খুশি করার জন্যে?

'আর কারও জন্যে নয়? স্বর্গের দেবতারা সবাই নেমে এলেও যে কাজ করতে পারত না, সেই অসম্ভব কাজ তুমি একা সম্ভব করেছ শুধু আমার দিকে চেয়ে?'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'দেরুশেতকে ভালবাসো না, এমন ডাহা মিথ্যে কথাটা কি করে বললে তুমি? আমাকে এ কথাও বিশ্বাস করতে বলো? বুড়ো হয়েছি বলে কি আমি কিছুই বুঝি না?'

ওর জবাবের জন্যে একটু অপেক্ষা করল বৃদ্ধ, কিন্তু এত কথার পরও ছেলেটা নীরব, একটা কথাও বলছে না দেখে মন দমে গেল তার। সন্দেহ দেখা দিল।

'তাছাড়া, বাবা!' এবার অনুনয়ের সুরে বলল লেতিয়ারি, 'দেরুশেত যে তোমাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে! এখন যদি তুমি বিয়ে না করো, তাহলে যে ওকে সারাজীবন কুমারী থেকে যেতে হবে! না, না, গিলিয়াত। তা হয় না, বাবা। এ কিছুতেই হতে পারে না।

'তুমি দেরুশেতকে অবশ্যই বিয়ে করবে, তুমি আমার নতুন দুরান্দের ক্যাপ্টেন হবে, আমরা তিনজন মিলে আবার নতুন করে আমাদের সংসার গড়ে তুলব। তুমি এখন না বললে তো চলবে না, বাবা!

'না, এ ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি শুনতে চাই না আমি। দাঁড়াও না, সকাল হলেই গির্জার ফাদারকে চিঠি দিচ্ছি আমি। যাতে সকালেই উনি তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। নাহ্, আর দেরি করা যায় না।'

আপনমনে বক্ বক্ করে চলেছে লেতিয়ারি, টেরও পায়নি কখন চলে গেছে গিলিয়াত। বাইরে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ও, যেন ভেবে পাচ্ছে না কোনদিকে যাবে।

চাঁদ ডুবে যেতে বসেছে, হলদেটে হয়ে এসেছে আলো। একটু দূরে অশান্ত চ্যানেলের বড় বড় ঢেউ অবিশ্রান্তভাবে তীরে আছড়ে পড়ছে। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

পনেরো

সাগরতীর থেকে খানিকটা ভেতরে, স্যামসনের এক প্রান্তে সেইন্ট পিটার গির্জা। নিয়মিত প্রার্থনাকারীদের কেউই আজ গির্জায় আসেনি গ্রাম ফাঁকা বলে।

গ্রাম ফাঁকা কারণ গিলিয়াত নামের সেই হতচ্ছাড়া, ভবঘুরে ছেলেটা ভয়ঙ্কর ডোভার থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি দূরান্দের এনজিন উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে, এ খবর ছড়িয়ে পড়তে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই জাহাজ ঘাটে ছুটে গেছে।

সকাল দশটায় গির্জায় এসে ঢুকল রেভারেন্ড কড্রে, দেরুশেত ও গিলিয়াত। ক্লান্ত দেহে রাত জাগার ফলে শুকনো মুখটা আরও শুকিয়ে এতটুকুন গেছে গিলিয়াতের। ভীষণ ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক লাগছে ওকে। ওদিকে বর-কনের মুখে কথা নেই। জড়পিণ্ডের মত হাঁটছে ওরা।

ভেতরে একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে তিনজন লোক। সৌম্য চেহারার ফাদার, গির্জার সচিব ও বিয়ে রেজিস্ট্রি করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত এক কর্মচারী। তাদেরই গির্জার এক রেভারেন্ডের সাথে মাদামোয়াজেল দেরুশেতের বিয়ে

রেজিস্ট্রি করাতে হবে, তাই পাত্র-পাত্রী ও পাত্রীর অভিভাবকের অপেক্ষায় আছে লোকগুলো।

বিয়ে সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করাই আছে, এখন শুধু বর-কনে কিছু ফাঁকা ঘর পূরণ করে স্বাক্ষর করে দিলেই হয়। কনেসহ বর রেভারেন্ড কড্রে ও গিলিয়াতকে ভেতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন ফাদার ও অন্য তিনজন। ফাদারের সৌম্য মুখে হাসি ফুটল।

'আসুন, আসুন! আমরা আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। সব কিছু ঠিক করা আছে, অনুষ্ঠান শুরু করতে বিশেষ কোন বাধা নেই।'

একটু থামলেন তিনি। একে একে তাদের তিনজনকে দেখে নিয়ে বললেন, 'আপনাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করানোর আবেদন আরও আগে পেলে ভাল হতো, এত আড়াহুড়ো করতে হতো না। যাই হোক, সমস্ত আয়োজন সারা হয়ে গেছে।

'বরের পক্ষে বিয়ের সাক্ষী হবেন আমাদের গির্জার সচিব, কিন্তু কনের পক্ষে ' কথা শেষ না করে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে গিলিয়াতের দিকে তাকালেন ফাদার। তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়ল যুবক—কনের পক্ষে ও নিজে সাক্ষী হবে।

'তাহলে আর কি!' ফাদার মাথা নাড়লেন। 'ঠিকই আছে, আর বিশেষ কোন সমস্যা নেই।'

আড়চোখে এক পলক গিলিয়াতকে দেখল বর রেভারেন্ড কড্রে। লোকটার ডোভার অভিযানে যাওয়ার মূল প্রেরণার উৎস কি ছিল, সে কথা এখন আর অজানা নেই তার। কাজেই সঙ্কোচ বোধ করছে সে। ওদিকে দেরুশেতও আড়ষ্ট হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। ওদের বিয়ে দিতে গিলিয়াত এত ব্যগ্র কেন, তাই ভাবছে সকাল থেকে!

'না, একটু ভুল হলো,' ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে কড্রের দিকে তাকালেন ফাদার। 'সমস্যা একটা এখনও আছে,' গিলিয়াতকে নির্দেশ করলেন। 'আজ খুব ভোরে এই ভদ্রলোক এসে মাদামোয়াজেল দেরুশেতের বাবার হয়ে আপনাদের বিয়ের অনুমতির জন্যে লিখিত আবেদন করেছেন।

'এঁর মুখে শুনেছি, মঁশিয়ে লেতিয়ারি খুব জরুরি এক কাজে ব্যস্ত বলে বিয়েতে থাকতে পারবেন না। কিন্তু তিনি চান, বিয়েটা যেন আজ সকালের মধ্যেই হয়ে যায়। তাঁর ইচ্ছের ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ করার কিছু নেই।

'কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে মঁশিয়ে লেতিয়ারি স্বয়ং কনের বাবা ও অভিভাবক। এরকম ক্ষেত্রে আমাদের গির্জার আইনমতে কিছুটা সমস্যা আছে। তা হচ্ছে, কনের অভিভাবকের মৌখিক ইচ্ছেকেই যথেষ্ট বলে মনে করে না আমাদের আইন।

'এ জন্যে লিখিত প্রয়োজন। মঁশিয়ে লেতিয়ারির নিজ হাতে লেখা একটা চিঠি বা ওরকম কিছু একটা হলে ভাল হয়,' আবার ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হাসলেন ফাদার। 'আপনারা নিশ্চই বুঝতে পারছেন ...

নড়ে উঠল গিলিয়াত। পকেট থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে ফাদারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন ফাদার, এ ব্যাপারে মঁশিয়ে লেতিয়ারির নিজ হাতে লেখা চিঠি। পড়ে দেখুন। আর তাড়াতাড়ি করুন দয়া করে। এ জন্যে দেরি করার প্রয়োজন দেখি না আমি।'

ভাঁজ খুলে কাগজটা দেখলেন ফাদার। ছোট্ট একটা চিঠি. ওই দিনের তারিখে লেখা।

সেটা এরকম ঃ ফাদারের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতিপত্র চেয়ে নিয়ে এসো। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের বিয়েটা হয়ে যাক। আর একটুও দেরি করতে রাজি নই আমি।

–লেতিয়ারি।

চিরকুটটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে দিলেন ফাদার। মুখ তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে গিলিয়াতের দিকে তাকালেন।

'এতে কিন্তু কিছুই প্রমাণ হয় না, মঁশিয়ে। মঁশিয়ে লেতিয়ারির সই থাকলেও এটা কাকে লেখা, বোঝা গেল না। কোন সম্বোধন বা সেরকম কিছুই নেই।

'চিঠিতে বিয়ের কথা আছে বটে, কিন্তু কার সঙ্গে কার বিয়ে, সে ব্যাপারেও কিছু লেখেননি মঁশিয়ে লেতিয়ারি। পড়ে তো আমার মনে হয়, পত্রবাহক যে-ই হোন, তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে এটায়।'

একটু থামলেন ফাদার। 'তবে ভদ্রলোক নিজেই যখন এ বিয়ের সাক্ষী হতে এসেছেন, নিজেই বলছেন এটা এই দু'জনের বিয়ের ব্যাপারেই লিখেছেন মঁশিয়ে লেতিয়ারি, তখন চিঠিটাকে বিয়ের প্রধান দলিল হিসেবে গ্রহন করতে আমাদের আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।

'আমাদের একজন সহকর্মীর বিয়ের ক্ষেত্রে এরচেয়ে বড় প্রমাণ আর দরকার নেই। এবার তাহলে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করে দেয়া যেতে পারে।'

ধীরে ধীরে বসলেন বৃদ্ধ ফাদার। কলমদানী থেকে কলম তুলে নিয়ে বিয়ের দলিলের শূন্য ঘরগুলো নিজেই একে একে পূরণ করতে লাগলেন।

কাজটা শেষ হতে বর ও কনেকে কাছে ডাকলেন। হাত ধরাধরি করে ধীর পায়ে টেবিলটার দিকে এগোল কদ্রে ও দেরুশেত। ওদের জীবনের এক পরম লগ্ন এটা, তাই দু'জনেই মনে মনে উত্তেজিত। গিলিয়াত একটু দূরের এক পিলারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, দেরুশেতকে দেখছে একদৃষ্টে।

চোখের সামনে বাইবেল মেলে ধরে বিয়ের গৎ বাঁধা শ্লোক আওড়ালেন ফাদার, তারপর মুখ তুলে অমুকের সঙ্গে তমুকের বিয়ে ঘোষণা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই দু'জনের বিয়েতে কারও কোনরকম আপত্তি বা বাধা আছে বলে জানা আছে আপনাদের কারও?'

কেউ জবাব দিল না দেখে সন্তুষ্ট হলেন ফাদার। 'কনে সম্প্রদান কে করবেন?'

গিলিয়াত আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। 'আমি, ফাদার।'

অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল গির্জার হলরুমে, আপনজনকে একান্ত করে পাওয়ার আনন্দের মাঝেও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি অনবরত খুঁচিয়ে চলেছে কদ্রে ও দেরুশেতকে। কেউই গিলিয়াতের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

'বিয়ের আংটি কোথায়?' ফাদারের প্রশ্নে নীরবতা ভঙ্গ হলো।

লজ্জায় পড়ে গেল কদ্রে। অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হুড়োহুড়িতে কনের জন্যে আংটির ব্যবস্থা করা হয়ে ওঠেনি। কথাটা মনেই ছিল না। গিলিয়াত উদ্ধার করল

তাকে। ওর নিজের হাতের একমাত্র আংটিটা খুলে নীরবে তার হাতে তুলে দিল।

চরম বিব্রত চেহারায় ওটা নিল কড্রে, কোনমতে দেরুশেতের কম্পিত বাঁ হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিয়ে ফাদারের সাথে গলা মিলিয়ে ওকে আমৃত্যু সহধর্মিনী হিসেবে গ্রহন করার ঘোষণা উচ্চারণ করল।

***

জাহাজঘাটে বেজায় ভিড়। গোটা স্যামসন ভেঙে পড়েছে যেন দুরান্দের এনজিন দেখতে। ওদিকে লেতিয়ারি নিজের বিছানায় শুয়ে রয়েছে। ভীষণ আনমনা সে, গম্ভীর।

কিছু ভাবছে। হয়তো গিলিয়াত আর দেরুশেতের কথাই ভাবছে। বেলা তো কম হলো না, এতক্ষণে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়ই!

সেই সকাল থেকে এ পর্যন্ত মেয়েকে দেখেনি লেতিয়ারি। কখন গিলিয়াতের সাথে গির্জায় চলে গেছে কে জানে! বিয়ের জন্যে এতই ব্যস্ত যে বুড়ো বাপের কথা একবারও মনেই পড়েনি হয়তো, ভাবছে সে।

তা ব্যস্ত হওয়ারই কথা। যে নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে লেতিয়ারিকে তার মেয়েসহ পথে বসার হাত থেকে উদ্ধার করেছে, জন্ম-জন্মান্তরের জন্যে ঋণী করে ফেলেছে তাদেরকে, তার মত একজন বীরকে স্বামীত্বে বরণ করার মত সৌভাগ্য ক'জন মেয়ের হয়? হোক না সে 'হতচ্ছাড়া ভবঘুরে'।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গেছে ওদের, ভাবল বৃদ্ধ। বলা যায় না, যে কোন মুহূর্তে তার আশীর্বাদ নিতে ফিরে আসবে ওরা! কথাটা মনে হতেই ধড়মড় করে উঠে বসল লেতিয়ারি।

হায়! যদি জানত কি অকল্পনীয় নাটক চলছে তখন সেইন্ট পিটার গির্জায়। যদি জানত তার সমস্ত স্বপ্নসাধ ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেছে ততক্ষণে! কিছুই জানতে পারল না বৃদ্ধ। জানল কেবল নিষ্ঠুর বিধাতা।

অন্তরীক্ষে বসে নির্বিকার চিত্তে সেই বিয়োগান্তক নাটক উপভোগ করছে সে প্রাণ ভরে।

***

বিয়ে সেরে ওরা যখন গির্জা থেকে বের হলো, ঘাটে তখন কাশমিরের ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া প্রায় শেষ। ওটায় করে আজ, এখনই সস্ত্রীক লন্ডনে চলে যাচ্ছে কড্রে।

উপায় নেই, যেতেই হবে। নইলে মামার শেষকৃত্যে যোগ দিতে পারবে না সে।

'চলুন, চলুন!' ওদের দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল গিলিয়াত। 'জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে দেখছেন না!'

ওর দিকে চকিতে একপলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল দেরুশেত। আজ ভোরবেলা থেকে তাদের দু'জনের বিয়ে নিয়ে মানুষটা যে তৎপরতা দেখাল, ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যময় লাগছে ওর। কিন্তু সে ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না মনে, ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ল দেরুশেত।

জাহাজ ছাড়তে সত্যি আর দেরি নেই, এখন লেতিয়ারির সাথে দেখা করে তার আশীর্বাদ নিতে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে। তাই ঠিক হলো, আজ আর তার সাথে দেখা করতে যাবে না বর-কনে। বরং লন্ডন থেকে একটা চিঠিতে বৃদ্ধকে এর কারণ খুলে জানাবে তারা। লেতিয়ারি যে এ বিয়েতে মত দিয়েছে, তাতে দেরুশেত বা কড্রের মনে কোন সন্দেহ নেই।

কারণ অনুমতি দিয়ে লেখা তার চিঠি তো তারা দেখেছে। কাজেই বিশেষ কারণে দেখা করতে না পারার ত্রুটি নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবে সে।

জোর পা চালিয়ে আগে আগে জাহাজ ঘাটের দিকে চলল দেরুশেত ও কড্রে, গিলিয়াত রয়েছে ওদের একটু পিছনে। উপযুক্ত জেটির অভাবে এখানে তীর থেকে সরাসরি জাহাজে চড়ার উপায় নেই, নৌকায় করে উঠতে হয়। তাই নৌকার দিকে এগোল ওরা।

কড্রে আগে উঠল নৌকায়। দেরুশেত তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, এই সময় পিছন থেকে গাউনে টান পড়তে ঘুরে তাকাল। দেখল গিলিয়াত ওর গাউনের প্রান্ত ধরে আছে।

'কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ করে বিদেশে চলে যেতে হচ্ছে,' চোখাচোখি হতে অপ্রস্তুতের মত হাসল যুবক, 'জামা-কাপড় কিছুই তো নিয়ে যেতে পরলে না। কিন্তু ওসব ছাড়া চলবে কি করে? তাই জাহাজে তোমাদের কেবিনে একটা বড় বাক্স রেখে এসেছি আমি, ওর মধ্যে মেয়েদের কয়েক সেট পোশাক আছে। সব নতুন।'

একটু দ্বিধাগ্রস্থ দেখাল গিলিয়াতকে। 'ওগুলো আমার মা জমিয়ে রেখেছিলেন নিজের ছেলের বউ এলে তাকে দেবেন বলে। তুমি ওগুলো গ্রহন করলে আমি খুশি হবো!'

বলার মত কিছু খুঁজে পেল না দেরুশেত, কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

গিলিয়াত নিচু স্বরে বলে চলল, 'তোমাকে কোনদিন নিজের মনের কথা বলা হয়নি আমার। জীবনে আর কখনও হবেও না, তাই এই ফাঁকে কয়েকটা কথা বলে নিই।

'যেদিন দুরান্দের ডুবে যাওয়ার খবর আসে, সেদিন আরও অনেকের সাথে তুমিও ছিলে তোমাদের বৈঠকখানায়। তখন সাময়িক উত্তেজনাবশেই বোধহয় সেখানে একটা প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলে তুমি।

'এখন বুঝতে পারছি একটা কথার কথা ছিল সেটা। মঁশিয়ে লেতিয়ারিও ঈশ্বরের নামে শপথ করে একই ধরনের কথা বলেছিল সে সময়ে। কথাটা তোমার মনে নেই, বুঝতে পারছি। তা ভুলে যাওয়ারই কথা।

'এরকম প্রতিজ্ঞা তো আমরা কতই করে থাকি, সব কি আর মনে রাখা যায়? না রাখলেই তা পালন করা সম্ভব হয়? আর মঁশিয়ে লেতিয়ারির তো তখন দুরান্দ হারিয়ে পথে বসার দশা, মাথার ঠিক ছিল না। কি বলতে কি বলেছিল! সে কবেকার কথা, কে অতসব মনে করে বসে থাকে!'

একটু থামল যুবক। মুখে বিষন্ন হাসি। হাত তুলে দূরের বড়সড় একটা জটলা দেখাল দেরুশেতকে।

'ওই যে ওখানে ভিড় করে আছে মানুষ, কেন বলতে পারো? স্যামসনের সবাই দুরান্দের এনজিন দেখতে এসেছে। অনেক বলে-কয়েও যখন ওটাকে উদ্ধার করে আনতে কাউকে ডোভারে পাঠানো যাচ্ছিল না, নগদ টাকার কথা বলেও না, তখন আমি এক কথায় যেতে রাজি হয়েছিলাম। কোন কথার ওপর, আজ আর তার কোন মূল্য নেই। আর সে অনেক বছর আগের এক বড়দিনের কথা, স্যামসনের রাস্তা বরফের তলায় চাপা পড়ে ছিল সেদিন। তুমি গির্জা থেকে ফেরার সময় পথের ওপর কি যেন লিখেছিলে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা আমারই নাম।'

শ্রাগ করল গিলিয়াত। 'কি জানি! সেদিন তো বেশ কুয়াশা ছিল, হয়তো ওর মধ্যে ভুলই দেখেছি! যাক্‌গে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

'তোমাদের যাত্রা আজ ভালই হবে মনে হচ্ছে। কেমন পুবাল বাতাস বইছে দেখেছ? যাও তাহলে! বিদায়!'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে একটু পিছিয়ে এসে দাঁড়ল গিলিয়াত। পনেরো মিনিটের মধ্যে জাহাজে উঠে পড়ল দেরুশেত ও কড্রে। একটু পর ঘণ্টা বাজাল কাশমির, ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর তোলা হলো। ঘাট ছেড়ে পিছিয়ে গিয়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘুরতে শুরু করল ওটা। ঘাড় কাত করে সেদিকে একভাবে তাকিয়ে থাকল যুবক।

বুকের ভেতরে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ওর। জীবনে এই প্রথমবার মনে হলো, ঈশ্বর সৃষ্ট এতবড় পৃথিবীতে সে সত্যিই বড় একা। ভীষণ একা। জীবনটা যেন কেমন তার, আদি-অন্ত হীন নিরস, ধূ ধূ মরুভূমির মত। বসন্তের বাতাস বইল না সেখানে, ফুল ফুটি ফুটি করেও ফুটল না, পাখি ডাকল না।

বেখেয়ালে এক চিল্‌তে রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে 'মহিষ পাহাড়ে' এসে উঠল গিলিয়াত। পুবাল বাতাস পেয়ে সাগরের পানি যে হু হু করে বাড়ছে, সেদিকে মনে হলো খেয়ালই নেই।

অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে বেশ কিছু সময় ধরে কি যেন ভাবল ও। মনে হলো গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিসের, তা সে-ই জানে। নিজের বাড়িটা এক পলক দেখে নিল ও, তারপর লেতিয়ারির বাড়ির দিকে তাকাল।

গোটা স্যামসনের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল বিষাদ মাখা অলস দৃষ্টি। তারপর আরেকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সিংহাসনের

ওপর বসে পড়ল পা ঝুলিয়ে। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে আরও আগেই–পুবাল বাতাসের তাড়নায় ওর চারদিকের গ্র্যানিটের দেয়ালে ছলাৎ ছল্ শব্দে আছড়ে পড়ছে ইংলিশ চ্যানেল।

কিন্তু গিলিয়াত নির্বিকার, যেন এ জগতে নেই। পানির শব্দ ছাপিয়ে দূর থেকে কাঠ কাটার শব্দ আসছে। লেতিয়ারি বোধহয় ওর নৌকা থেকে এনজিনটা নামানোর জন্যে লোক লাগিয়েছে।

পশ্চিম দিকে তাকাল গিলিয়াত। এইমাত্র ঘোরা শেষ করেছে কাশমির, 'মহিষ পাহাড়ের' কাছ ঘেঁষে মন্থর গতিতে গভীর সাগরের দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

ডেকে বসা দেরুশেত ও কড্রের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল গিলিয়াত। ওরা দু'জনও তীরের দিকে তাকিয়ে আছে একভাবে। কথা নেই কারও মুখে।

হঠাৎ 'মহিষ পাহাড়ের' ওপর চোখ পড়তে বিস্মিত হলো দেরুশেত। ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'দেখো, দেখো! ওই পাহাড়ের চুড়োয় কে যেন বসে আছে! সাগরে তো জোয়ার এসে গেছে, তারপরও বসে আছে লোকটা! হুঁশ নেই নাকি?'

জবাবে কড্রে কি বলল জানা হলো না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে গিলিয়াতের পা ছুঁয়ে ফেলল পানি। তারপর দেখতে দেখতে হাঁটু পর্যন্ত উঠে এল। ও শুধু একবার নিচের দিকে তাকাল, পানি কতখানি উঠেছে দেখে নিয়ে আগের মত অপলক, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দ্রুত বিলীয়মান জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্য কোনদিকে খেয়ালই নেই।

অনুকূল বাতাস পেয়ে ভালই গতি লাভ করেছে কাশমির, ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। এরই মধ্যে প্রায় দিগন্তে পৌঁছে গেছে।

তবু গিলিয়াতের সেদিক থেকে নজর ফেরানোর কোন লক্ষণ নেই, চেয়ে আছে তো আছেই।

এক ঘণ্টা কেটে গেছে এর মধ্যে, পানি ওর কোমর পর্যন্ত উঠে এসেছে, তবু হুঁশ ফিরছে না। যেন দু'চোখ মেলে পৃথিবীর শেষ সীমা অব্দি জাহাজটাকে অনুসরণ করতে না পারলে ফিরবেও না।

আরও এক ঘণ্টা কাটল। আবছা ধোঁয়াটে দূর দিগন্তে কাশমিরকে দেখতে লাগছে ছোট একটা ম্যাচবাক্সের মত। ক্রমে আরও ছোট হয়ে আসছে। সূর্যের শেষ বিকেলের নিস্তেজ রশ্মি চ্যানেলের বুকে অদ্ভুত মায়াবি এক রঙের মেলা বসিয়েছে।

গিলিয়াতের চারদিকের লোনা পানি খল্ খল্ ছল্ ছল্ শব্দে প্রাণ খুলে হাসছে। জাহাজ ঘাটের কোলাহল জোয়ারের পানির ভয়াবহ শব্দের কাছে হার মেনে গেছে অনেক আগেই।

ও বসে আছে ধ্যানমগ্নের মত। গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি, কোনমতে মাথাটা জেগে আছে কেবল, তবু গিলিয়াত 'মহিষ পাহাড়ের' মত অবিচল, অনড়।

মাথার ওপর গাঙচিল ও অন্যান্য সামুদ্রিক পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে, ডানা ঝাপ্টে আর অবিরাম চিৎকার করে বৃথাই বোকা লোকটাকে সতর্ক করার চেষ্টা করছে ওরা। কোন কাজ হচ্ছে না।

কাশমির ততক্ষণে অনেক অ-নে-ক দূরে চলে গেছে। অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে ওটাকে, একটা বিন্দুর মত। গিলিয়াতের দু'চোখ এখনও একভাবে অনুসরণ করছে জাহাজটাকে। পৃথিবীর কোন কিছুর সাথেই তার সেই বিষাদ মাখা করুণ

দৃষ্টির তুলনা চলে না।

সেখানে ফুটে আছে সব হারানোর কঠিন মর্মবেদনার ছাপ। দীর্ঘদিন ধরে মনের রাজ্যে একটু একটু করে গড়ে তোলা কল্পনার রঙিন বাসর আচমকা ঝড় এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে এমনই হয় বোধহয়।

অপ্রত্যাশিত বেদনায় হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত গিলিয়াতের, অথচ কারও বিরুদ্ধে তিল পরিমাণ অভিযোগ নেই। এক ফোঁটা চোখের পানিও ফেলেনি। মুখ বুজে জীবনের এতবড় ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু অন্তর সে কষ্ট সয়ে নিতে পারলেও চোখ দু'টো পারেনি বোধহয়। তাই এত বিষাদ, এত বেদনা আর ব্যাকুলতা ফুটে আছে সেখানে।

ধীরে ধীরে গোধুলির আবছা অন্ধকার নেমে আসছে স্যাম্সনে। গ্রামে থেকেও গ্রামছাড়া বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে–মনে হচ্ছে মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছে ওটা, কাকে যেন খুঁজছে ব্যাকুল হয়ে। আরেকদিকে লেতিয়ারির বিশাল বাড়িতে কিসের যেন হই-চই চলছে।

বৃদ্ধ কি করছে এখন কে জানে! বোধহয় মেয়ে-জামাইয়ের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে অস্থির চিত্তে।

ধরনী থেকে গোধুলির সামান্য আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে এখন। কুয়াশায় পুরোপুরি ঝাপ্সা হয়ে গেছে দিগন্ত, তাই কাশমিরকে আর দেখা যাচ্ছে না।

ওটার চিহ্ন মুছে গেছে ধরণীর বুক থেকে, একই সঙ্গে গিলিয়াতের মাথাটাও পানির নিচে তলিয়ে গেছে। আর উঠল না হতভাগ্য যুবক। 'মহিষ পাহাড়ের' মাথায় বড় বড় ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল ভরা জোয়ারের পানি, কিছুক্ষণের মধ্যে

গোটা পাহাড় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সদ্য সন্তানহারা, বেদনাকাতর মায়ের মত কি এক অব্যক্ত আকুতি নিয়ে গিলিয়াতের বাড়ির পায়ের কাছে বারে বারে মাথা খুঁড়তে লাগল ইংলিশ চ্যানেল। উন্মাতাল বাতাস আর পানির মিলিত বোবা কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে সাঁঝের পরিবেশ।

দিনের আলো মুছে গিয়ে আঁধারের রাজত্ব শুরু হয়েছে গেরানসি দ্বীপের স্যামসন গ্রামে। রাত নেমেছে। ব্যতিক্রমী এক রাত।

গ্রামবাসীরা কেউ জানে না, আর কোনদিন গভীর নিশীথে ঘুম ভাঙলে সেই খেয়ালী বাঁশিওয়ালার মনকাড়া সুরের জাদু শুনতে পাবে না তারা।

সারাদিন মাছ ধরে আর বাঁশি বাজিয়ে বেড়ানো সেই হতচ্ছাড়া, ভবঘুরে ছেলেটি চিরতরে হারিয়ে গেছে।

শেষ

আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ স্পাই থ্রিলার

নাভেদ রেজা

বাংলাদেশ সিক্রেট সার্ভিসের নির্ভীক বেপরোয়া সাহসী এক স্পাই।
আমাদেরই মত সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ, কিন্তু
কাজ একেবারে ভিন্ন ধরনের।
ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সব অভিযানে ভরা!
পায়ে পায়ে মৃত্যুর হাতছানি, অথচ পরোয়া নেই।
নিজেকে দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করেছে
নাভেদ রেজা
দেশবিরোধী মানবতাবিরোধী ষড়যন্ত্রের
ক্ষেত্রে আপোষহীন।
প্রাণ হারানোর ভয় আছে প্রতি মুহূর্তে,
কিন্তু রেজা নিঃশঙ্ক, অদম্য।
অন্যায় অবিচার-অত্যাচার সইতে পারে না,
প্রতিপক্ষ যত ক্ষমতাধরই হোক না কেন, ঝাঁপিয়ে পড়তে
বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

পাঠক, এই বেপরোয়া একনিষ্ঠ দেশসেবকটিকে
কাছ থেকে জানতে মন চাইছে না?
ধৈর্য ধরুন – ও আসছে।

কিশোর ক্লাসিক

টয়লার্স অভ দ্য সী

ভিক্টর হুগো

রূপান্তর ঃ সমীর দাস

স্যামসনের এক দুঃসাহসী, ভবঘুরে যুবক, গিলিয়াত। বাঁশি বাজিয়ে আর দুরন্ত সাগরে মাছ ধরে ওর দিন কাটে। এরই মাঝে অপূর্ব সুন্দরী দেরুশেতের প্রেমে পড়ল সে। কিন্তু বেচারা মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারেনি কোনদিন।

প্রেয়সীর চোখের পানি মোছাতে মহাবিপজ্জনক ডোভার আইল্যান্ডে গেল গিলিয়াত, সফল হয়ে ফিরেও এল।

কিন্তু একদিন যে রেভারেন্ড কড্রের প্রাণ বাঁচিয়েছিল গিলিয়াত, সে-ই কিনা ...

তারপর কি হলো? দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেল গ্রামে থেকেও গ্রামছাড়া বাড়িটার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কি আকুতি জানাচ্ছে বারবার?

ঊর্মি প্রকাশনী

রুচিশীল পাঠকের প্রিয় সঙ্গী

বাড়ি # ১৩-এ, রোড # ৩, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন ঃ ৯৬৬৫৮৮৯, ০১৭-০৫৮৯৫৫